শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ

প্রবক্তা

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু

শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিঅমল পরমহংস মহারাজ কর্ত্তৃক

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া,

হইতে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করন

শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা

১৪ই জুলাই, ১৯৯৯

© সংঘাচার্য্য কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থানঃ—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ রোড্,
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া,
পিন্ নং—৭৪১৩০২
ফোন্—(০৩৪৭২) ৪০০৮৬
'www.scsmath.com'
email: 'govindam@scsmath.com'

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পার্ক,
কলিকাতা—৭০০ ০৫৫
ফোন্—৫৫১ ৯১৭৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড্,
গৌরবাটসাহি, পুরী, উড়িষ্যা
পিন্ নং—৭৫২০০১
ফোন্—(০৬৭৫২) ২৩৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ—হাপানিয়া,
জেলা—বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়ামোড়,
উত্তর চব্বিশ পরগণা
পিন্ নং—৭৪৩৫১৮

শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দশবিসা, পোঃ গোবর্ধন, মথুরা,
উত্তর প্রদেশ ২৮১৫০২
ফোন (০৫৬৫) ৮১২১৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
৯৬ সেবাকুঞ্জ, বৃন্দাবন,
মথুরা, উত্তর প্রদেশ ২৮১১২১
ফোন্—(০৫৬৫) ৪৪৪০২৪

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
৪৬৬ গ্রীন স্ট্রীট্,
লণ্ডন E13 9DB, U.K.
ফোন্—(০১৮১) ৫৫২ ৩৫৫১

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সেবাশ্রম
২৯০০ নর্থ রোডিও গল্চ্ রোড্,
সোকেল, (ক্যালিফোর্নিয়া)
CA 95073, U.S.A.
ফোন্—(৪০৮) ৪৬২ ৪৭১২

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর মিশন
"শ্রীগোবিন্দধাম"
পো. অ. বক্স ৭২ উকি,
ভায়া মুরিলুম্বা N.S.W. 2486,
Australia.
ফোন্—(০৬৬) ৭৯৫৫ ৪১

শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ আশ্রম
নবদ্বীপ ধাম রোড্,
লঙ্গ মাউন্টেন,
মরিসাস্
ফোন্—(২৩০) ২৪৫ ৩১১৮

অনন্ত প্রিণ্টিং, সোকেল, ক্যালিফোর্নিয়া কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বা-গোবিন্দসুন্দরজীউ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

জগদ্গুরু পরমারাধ্য পরমহংস বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামীর শ্রীমুখনিঃসৃত দিব্য সুমধুর বাণীর অনন্তবিগলিত ধারার কয়েক বিন্দু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা শ্রীরূপ-সরস্বতী-শ্রীধর-গোবিন্দ ধারার কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শনের ক্ষুদ্র প্রয়াস করিলাম। তাঁহার দিব্য মঙ্গলময় ইচ্ছার কিছুটা অনুভব করিয়া মাদৃশ ভগবৎবিমুখ অর্ব্বাচীন বহির্ম্মুখ জীবকে তার নিজস্ব সম্পদ ভগবদ্ভক্তিতে উদবুদ্ধ করিবার জন্যেই আমাদের এই সামান্য প্রয়াস। আজ যাঁহার কথায় অনুপ্রেরিত হইয়া সমস্ত বিশ্বের অগনিত জনগন তুমুল হরিনাম সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া আত্মমঙ্গলের পথ অনুসরণ করে সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকৈতব সেবার সুবর্ণ সুযোগ আমাদের লাভ হইয়াছে।

বিগত দশ বছরের ইতিহাসে শ্রীগুরুদেবের দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতাবলীর ক্যাসেট (৯০ মিনিটের) সংখ্যা ৮৫০ অতিক্রম করিয়া প্রায় ৯০০ ছুইঁবার উপক্রম করিয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মাত্র কয়েকটি ইংরাজী ভাষায় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে আর বাংলায় এইটিই প্রথম। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া নিবাসী

পূজনীয়া দেবময়ী দিদির একান্ত উৎসাহ ও অক্লান্ত সেবা-প্রচেষ্টার ফলেই তাহা সম্ভব হইল। এই গ্রন্থরত্নটিতে গীতা, ভাগবত, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, উপনিষদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের সারমর্ম্ম এমন সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে ইহা অধ্যয়নে ঐকান্তিকী কৃষ্ণভক্তিই যে জীবচৈতন্যের চরম প্রাপ্তি তাহা বুঝিতে আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

পূজ্যপাদ শ্রীপাদ ভক্তিআনন্দ সাগর মহরাজ ও শ্রীপাদ শ্রুতশ্রবা প্রভু অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থের বাংলা টাইপ্-সেটিং করিয়া সর্ব্বসজ্জনগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থ সুষ্ঠুভাবে মুদ্রণকার্য্যে সান্তাক্রুজ-স্থিত "অনন্তপ্রিণ্টিং"এর স্বত্বাধিকারী প্রভু শ্রীনবদ্বীপ দাস ও প্রভু শ্রীসর্ব্বভাবন দাসের সহযোগিতার জন্যে তাঁহাদের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সম্প্রতি দশম বারের বিশ্বপ্রচার পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতমের সারাংশ ৩০০ শ্লোকের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার অনন্ত লেখনীর পাশাপাশি সেটিকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে চলিয়াছেন। আশাকরি আগামী দিনগুলিতেও তাঁহার কৃপাবারি স্বরূপ যে রত্নসমুহ টেপে সুরক্ষিত আছে তাহাও তাঁহার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া নিজ আসন অলংকৃত করিবেন।

পরিশেষে সকল পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া ভগবান চৈতন্যচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার অহৈতুকী কৃপাধারা যেন সকলের প্রতি বর্ষাধারার ন্যায় অকপটে বর্ষিত হয়।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
বিনীত
ভক্তিঅমল পরমহংস

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ।
শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা।
১৪ই জুলাই, ইং ১৯৯৯ সাল।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ

প্রথম অধ্যায়

অমৃত ফল

পরমতত্ত্ব ও তচ্ছক্তির সর্ব্বব্যাপিতা

যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার ভিতরেই শ্রীভগবান বাস করছেন। এমন নয় যে তিনি কেবল বৈকুণ্ঠ বা গোলোকেই আছেন, যদিও সেইটাই তাঁর পরমধাম যেখানে তাঁর নিত্যলীলার তরঙ্গ সর্ব্বক্ষণ প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে :—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(১/২/১১)

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা ভগবানের তিনটি প্রধান স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে পারি। এই তিনটি স্বরূপ হল ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। বহুদূরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমাদের শ্রীভগবান সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা হয় এবং তাই হল ব্রহ্ম।

যেমন সূর্য্যকে আমরা তার জ্যোতির মধ্যেই দেখি, তবুও সূর্য্যের অন্তস্থলে গতিশীল একটা বস্তুর অস্তিত্ব আছে। সূর্য্যের ভিতরে বাতাস, আগুন, অক্সিজেন ইত্যাদি নানাধরনের জিনিষ আছে। কিন্তু সূর্য্যের সেই ভিতরের জগতে আমরা ঢুকতে পারি না, আমরা কেবল বহুদূর থেকে একটা জ্যোতি দেখি। তেমনি শ্রীভগবানকে বহুদূরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শুধু একটা জ্যোতির্ময় রূপ দেখা যায়।

তারপর শ্রীভগবানের আর একটি স্বরূপ হল পরমাত্মা। প্রত্যেক জীবাত্মার হৃদয়ে পরমাত্মা বাস করেন। সমস্ত জীবাত্মাই এই জগতে নানারকমের কর্ম্ম করছে আর পরমাত্মা সর্ব্বদাই তাদের সঙ্গে আছেন তাদের সব কর্ম্মের সাক্ষী হয়ে। প্রত্যেক জীবাত্মা তার প্রকৃতি অনুযায়ী নিজ নিজ কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্মের ফল পায়। কিন্তু ভগবান তাঁর নির্গুণ প্রকৃতির জন্যে কোন কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না। সর্ব্বদা জীবের হৃদয়ে বাস করে পরমাত্মা তার সকল কর্ম্ম লক্ষ্য করেন। শুধু তাই নয় তিনি এই জড়জগতের সমস্ত পরমাণুর মধ্যেও বাস করছেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোন স্থান নেই যেখানে তিনি বাস করেন না। জীবাত্মা যখন শ্রীভগবানের ছায়াশক্তি মায়াকে উপভোগ করার চেষ্টা করে তখন তার যে স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত সেবার প্রবৃত্তি

সেটাকে সে ভুলে গিয়ে ভোগীর স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তবুও শ্রীভগবান সেইসব পতিত জীবাত্মাকে তাঁর দিব্যধাম, যা 'পরব্যোমধাম', 'বৈকুণ্ঠ' বা 'গোলোকবৃন্দাবন' বলে খ্যাত সেইখানে, জীবাত্মার সেই নিজ বাসভূমিতে, নিয়ে যেতে চান।

জীবের সত্তা চেতনময়

জীবাত্মা ভগবানের তটস্থা শক্তির অন্তর্গত। তাদের জন্ম হয় না, প্রকৃত অর্থে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী তারা ভগবচ্ছক্তি হতে প্রকাশিত হয়। একথা শাস্ত্রেই সমর্থিত হয়েছে। এইভাবে ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী যখন তারা প্রকাশিত হয়, তখন তারা নানা দেহে আবির্ভূত হয়।

এই পৃথিবীতে যত রকমের ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়েছে—তা হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম অথবা ইসলাম—যাই হোক না কেন, তাদের সকলের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল আছে যে তাদের সকলেরই লক্ষ্য হচ্ছে একই সত্যের দ্বার উদ্ঘাটন করার। এই জড়জগতের সৃষ্টি কি করে হয়েছে সেই তথ্যকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্যে, এবং দৃষ্টিকোণের দূরত্বের জন্যই জগতে নানারকমের ধর্ম্ম প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু বৈদিক ধর্ম্ম অথবা যে শিক্ষা বেদ-বেদান্ত থেকে এসেছে তা আমাদের এইটাই উপলব্ধি করায় যে—সকল জীবাত্মা ভগবানের তটস্থা

শক্তি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাশক্তি, অনুভব ও ইচ্ছাশক্তি তাদের মধ্যে আছে বলেই তারা প্রাণের কণা, চেতনার কণা, অণুচেতনা।

আজকের এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার যুগে আমরা জানি যে অ্যাটম, নিউট্রন, প্রোটন ইত্যাদি অণু-পরমাণুর, যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তা সবই এক গতিশীল অবস্থায় আছে। প্রত্যেক পরমাণুকে ঘিরে এক বিশেষ পরিমাণে অন্য কিছু উপাদান বিবর্ত্তিত হচ্ছে। বৈদিক সংস্কৃতি থেকেও আমরা জানি যে চেতনা সর্ব্বত্র রয়েছে। আজকের আধুনিক গবেষণা ও আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকগণ আমদের নানাকথা বলছেন। কিন্তু হাজার হাজার বছর আগেই বৈদিক শিক্ষায় আমরা জেনেছি যে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তার মধ্যেই চেতনা আছে।

একটা ইটকাঠের বাড়ির মধ্যেও চেতনা আছে। এই মুহূর্ত্তে আমরা এই বাড়িটার মধ্যে কোন গতি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু কয়েক শ বছরের মধ্যে দেখব এই বাড়ীটার কোন একটা থাম ভেঙ্গে পড়ে গেছে বা বাড়ীটার কোন একটা অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। আসলে কিছুই ধ্বংস হয়নি, বাড়ীটার ভিতরে ভিতরে যে অদৃশ্য গতি ছিল তাই এখন বাইরে আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়েছে।*

চেতনা সর্ব্বত্র এখানে সাধারণতঃ দুটি স্তরে অবস্থান করছে—(১) স্থাবর ও (২) জঙ্গম। যা স্থানু তাই হল স্থাবর

আর যা গতিশীল তাই হল জঙ্গম। গাছকে স্থাবর বলা হয় কারণ সে গতিশীল নয়, তবুও তার মধ্যে প্রাণ রয়েছে। একজন বাঙালী বৈজ্ঞানিক এটা আবিষ্কার করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে গাছের কষ্ট ও আরামের অনুভূতি আছে। সুতরাং প্রাণ সর্ব্বত্রই আছে আর এই প্রাণের নামই 'আত্মা'। আমাদের দেহের মধ্যে বহু লক্ষ প্রাণ আছে, জীবাণু ইত্যাদি। তবু একজন মুখ্য

---

* এখানে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে ইট কাঠ পাথরের মধ্যে যদি চেতনা থাকে তাহলে তাদের মধ্যে চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও অনুভবশক্তি নেই কেন? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' গ্রন্থে বলেছেন, "কথিত হইয়াছে বদ্ধজীব পঞ্চপ্রকার। যথা—(১) পূর্ণবিকচিতচেতন। (২) বিকচিতচেতন। (৩) মুকুলিতচেতন। (৪) সংকোচিতচেতন ও (৫) আচ্ছাদিতচেতন। এতন্মধ্যে পূর্ণবিকচিত-চেতন, বিকচিতচেতন ও মুকুলিতচেতন বদ্ধজীবগণ নরদেহপ্রাপ্ত। সংকোচিতচেতন বদ্ধজীব পশুপক্ষী-সরীসৃপ দেহগত। আচ্ছাদিতচেতন বৃক্ষ ও প্রস্তর গতিপ্রাপ্ত বদ্ধজীব কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হওয়ায় জীবের অবিদ্যাবন্ধন। ঐ বিস্মৃতি যত গাঢ় হয়, ততই চেতনবিশিষ্ট জীবের জড়দুঃখাবস্থাপ্রাপ্তি গাঢ় হইয়া পড়ে। চেতনধর্ম্ম যেখানে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, সে অবস্থা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ অবস্থা। কেবল সাধুসংস্পর্শ ও তৎপদরজপ্রাপ্তিদ্বারাই সেই অবস্থা হইতে মোচন হয়। অহল্যা, যমলার্জ্জুন ও সপ্ততাল-বিষয়ে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে। প্রদত্ত উদাহরণক্রমে ভগবৎসংস্পর্শই সে অবস্থার মোচন হয়। চেতনধর্ম্ম যেখানে সংকোচিত, সেস্থলেও (নৃগরাজার কৃকলাসত্ব মোচনে) কেবল ভগবৎসংস্পর্শই একমাত্র কারণ।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পঞ্চম-বৃষ্টি তৃতীয়-ধারা

আত্মা এই দেহের অধীশ্বর রূপে এই দেহকে চালনা করছে, তাকেই বলা হয় 'দেহী' বা 'আত্মা'। এই ভাবে প্রাণ সর্ব্বত্র আছে এবং যেখানে সে গতিশীল সেখানে তাকে বলা হয় 'জঙ্গম'। যখন আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায় তখন কি হয়? দুতিনদিনের মধ্যেই দেহের পচন শুরু হয়ে যায়। দেহ তো তখন আর নড়তে পারে না, দেহের ভিতরে পচনের জন্যই যেটুকু নড়াচড়া। মাসখানেকের মধ্যে শুধু হাড়গুলোই পড়ে থাকবে, তাও কিছুদিন পরে ফসিল হয়ে যাবে। গতিশীল আত্মার সর্ব্ব কর্ম্মের সাক্ষী থাকেন পরমাত্মা। যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার ভিতরেই পরমাত্মা আছেন। এই হল পরমাত্মার প্রকৃতি।

'ভগবান' হলেন স্বয়ং পরমেশ্বর। তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁর দিব্যলীলা নিত্যকাল ধরে চলেছে। এই আপেক্ষিক জগতে, এই নশ্বর জগতে তাঁর তটস্থাশক্তিগত জীবাত্মারা যেন কোন কারাগারে আবদ্ধ হয়ে আছে। এটাও ভগবানের লীলার একটা আপেক্ষিক দিক। জেলখানায় সমস্ত জনসংখ্যার খুব কম শতাংশ লোকই থাকে, হয়ত এক শতাংশ বা তারচেয়েও কম। সাধারণ লোকদের জেলে পাঠানো হয় না। তাঁরা নিজের নিজের বাড়ীতে থেকে নিজের নিজের কাজকর্ম্ম করেন। কেবল অপরাধীদেরই আইনতঃ জেলে পাঠানো হয়। আইন সকলের জন্যই, কিন্তু যাঁরা আইন ভঙ্গ করেন, জেল তাঁদের জন্যই। পৃথিবীতে বহুকোটি মানুষ থাকতে পারেন, কিন্তু হয়তো মাত্র

কয়েক শ হাজার লোক জেলে আছে। বাকীরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করছেন আর এই জগতে নিজেদের কাজকর্ম্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

বস্তু ও ছায়া—সেবাভূমি ও কর্ম্মভূমি

তেমনি চিন্ময় জগৎ যার নাম 'পরব্যোমধাম', সেখানকার অধিবাসীরা পরম সুখে দিন কাটান; তাঁরা যে স্তরে থাকেন সে হল 'সেবাভূমি'। সেখানে সকলেই সকলকে আনন্দ দেন। সেখানে যেমন সকলেই শ্রীভগবানের সেবা করেন তেমনি তিনিও তাঁদের সেবা করেন। যেমন পুত্র তাঁর পিতাকে সেবা করেন, তেমনি পিতাও তাঁর পুত্রকে সেবা করেন। এই পৃথিবীতেও আমরা এই ধরনের পারস্পরিক সেবা দেখেছি যেখানে বাবা মা ভাই বোন সকলে একসঙ্গে সুখে দিন কাটান।

জড়জগতে জীবের দুর্দ্দৈববিলাস

কিন্তু এখানে আমাদের ভূমিকাটা কি? কেউ এখানে স্বামী, কেউ প্রভু, কেউ ভৃত্য। কিন্তু সকলের আসল কাজটা কি? না, সেবা। এই হল এখানে সকলের আসল কাজ। পিতা হয়ত পুত্রের কাছ থেকে সেবা নেন, কিন্তু তিনিও পুত্রের সেবা করেন তাকে লালন পালন করে। সুতরাং

সেবাই এখানে সকলের কাজ। কিন্তু এই সংসারের এই সেবা বস্তুটি খুব ক্ষণস্থায়ী, তাই তার কোন প্রকৃত মূল্য নেই, কোন স্থায়ী ফল সে দিতে পারে না। যদি এখানে আমরা একটা ভাল বাড়ী তৈরী করতে পারি, তাহলে মনে করি এখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা থাকবে, আত্মীয় স্বজনরা থাকবে, আমাদের একটা ভাল টিভি সেট থাকবে আর আমরা সকলে এখানে সুখে দিন কাটাবো। কিন্তু খুব শীঘ্রই আমাদের আয়ু ফুরিয়ে যাবে। পরিণতিতে শেষপর্য্যন্ত আমাদের এই পৃথিবী ছেড়ে যেতেই হবে। আমাদের চেয়ে যারা বয়সে ছোট তারাও এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এমন নয় যে বড়রাই আগে যাচ্ছে আর ছোটরা পরে যাচ্ছে। যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন জায়গায় আমরা দেখতে পাই একে একে মানুষ চলে যাচ্ছে। সকলেরই এখানে মৃত্যু অবধারিত আর কার যে কখন যাওয়ার সময় হবে, কিছুই বলা যায় না। তাই যত চেষ্টাই করি না কেন এখানে আমরা কোনদিন সুখী হতে পারব না। আজ হয়ত আমি মনে করছি আমার টাকার দরকার। কিন্তু যার টাকা আছে সেই কি সুখী? তার ভাগ্যে কি আছে কে জানে? হয়ত তার এমন হজমের গণ্ডগোল হবে যে সে দু-চারগ্রাস ভাতের বেশী খেতে পারে না। আর যাকে দেখতে খুব সুন্দর সেও এখানে সুখী হতে পারবে না। যখন তার নাড়ী ঠিকমত চলবে না তখন তার দুশ্চিন্তা হবে যে তার কি অসুখ হয়েছে

যে তার শরীর ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আজ আমরা হয়ত দেখব একজন মানুষ খুব বিখ্যাত লোক হয়েছে, কিন্তু কাল হয়ত তার হাঁটবারও ক্ষমতা থাকবে না। এইভাবে এখানকার সব কিছু ক্ষণস্থায়ী যদিও এই ক্ষণস্থায়ী সংসারের প্রতি আমাদের খুব মায়া আছে। তবুও এখানে আমরা থাকতে পারব না।

এখানে যে বাড়ীটা আমরা নিজের হাতে তৈরী করেছি সেটাও নিজের বলে দাবী করতে পারব না। আর আমাদের সন্তানরাও সেই বাড়ী বেশীদিন উপভোগ করতে পারবে না। আজ যে টাকাকড়ি আমি আমার ছেলের কল্যাণের জন্য জমা করে যাব সে টাকা হয়ত একদিন সে নেশা করে বা ঐরকম কোন কাজে বা ক্ষতিকর উপায়ে উড়িয়ে দেবে। একজন যে টাকা জমাবে আর একজন তা উড়িয়ে দেবে, এই হল এ সংসারের নিয়ম।

সমস্ত জীবাত্মা ভগবানের তটস্থা শক্তি থেকে এসেছে আর পরব্যোমধাম নামে বিরাট, অনন্ত চিন্ময় জগতেই তাদের প্রকৃত বাসভূমি, সেখানেই তাদের নিজের ঘর আছে। বেশীর ভাগ জীবাত্মা সেখানে গিয়েই শ্রীভগবানকে সানন্দে সেবা করে। কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকটি জীবাত্মা এই ছায়াজগতের কারাগারের দিকে দৃষ্টি হেনেছিল, যদিও তাদের সুযোগ ছিল চিন্ময় জগতে গিয়ে সেবা করার। এই নশ্বর জগতের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার পর থেকেই তাদের দুর্ভাগ্য শুরু হয়েছে। এর বাইরে আমরা অন্য কোন কারণ

দেখি না কেন কিছু জীবাত্মা এই জড়জগতে এসেছিল। যখন এই জীবাত্মারা দুর্ভাগ্যবশে এই মায়ার জগতকে দেখল তখন তারা মনে করল, "এই জড়জগতের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ, সুতরাং এর উপর আমি প্রভুত্ব করব। এই জড়জগত হল আমার ভোগের জিনিস।" তাই এই মায়ার বা দুর্গের বা জেলখানার প্রতি তাদের এত আসক্তি আর সঙ্গে সঙ্গে মায়াও মাকড়সার মত তাদের নিজের জালে জড়িয়ে ফেলে।

তবুও শ্রীভগবান তাদের তাঁর চিন্ময় জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সবরকমের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যখন এই সংসারের দুরবস্থা চরমে ওঠে, ধর্ম্মের গ্লানি যখন খুব বেড়ে যায় তখন শ্রীভগবান স্বয়ং এখানে অবতরণ করেন। যেমন কোন জেলখানায় যদি কয়েদীরা খুব গণ্ডগোল শুরু করে তবে জেলখানার অধ্যক্ষ নিজেই এসে বা প্রতিনিধি পাঠিয়ে এখানে ওখানে কয়েকটা গুলি চালিয়ে বা অন্য যে কোন প্রকারে অবস্থাটা আয়ত্তের মধ্যে আনবেন। শ্রীভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন, তাঁর অসীম ক্ষমতা আছে, সেজন্যে তাঁর চিন্তার কোন কারণ নেই। যখন নারায়ণ বৈকুণ্ঠ থেকে আসেন তখন যে বৈকুণ্ঠ শূন্য হয়ে যায় তা নয়। শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছার দ্বারাই আর একজন নারায়ণ এখানে অবতীর্ণ হন। তাঁর সঙ্গে তাঁর চিন্ময় ইচ্ছাশক্তি, অনুভবশক্তি ও চিন্তাশক্তি আসে। তিনি সেই চিন্ময় স্তরেই থাকেন, এখানকার জড়জগতের স্তরে নয়।

এই জগতের যে মায়াপ্রকৃতি তাও শ্রীভগবানের শক্তিরই অংশ, কিন্তু এই শক্তি হল ছায়াশক্তি। আগুনের নিজের একটা স্বরূপ আছে, তেমনি আগুনের ছায়াও আছে। আগুনের স্বরূপটাই তার প্রকৃত অস্তিত্ব, যাকে ছাড়া তার ছায়া থাকতে পারে না। সেই আগুনের আলোতেই ছায়াকে দেখা যায়। এখন আমরা সেই ছায়াশক্তির মধ্যে এসে পড়েছি। এও ভগবানের শক্তির অংশ এবং এও নিত্য। এ চলতেই থাকবে। তেমনি আবার শ্রীভগবানের যে দিব্যলীলা, তাও চলতেই থাকবে।

সাধুগণের পরিত্রাতা শ্রীভগবান

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
(গীতা ৪/৭)

অর্থাৎ, "হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই।"

যখনই ধর্ম্মের নীতির মধ্যে, বিধিবিধানের মধ্যে ঘোর বিকৃতি দেখা যায়, তখনই শ্রীভগবান স্বয়ং এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন ধর্ম্মকে রক্ষার জন্য। কিভাবে? "পরিত্রাণায় সাধূনাম্।" এই পৃথিবীতে কিছু মহৎ লোক বাস করেন। যেমন জেলখানাতেও কিছু লোক আছেন যাঁরা নিজেদের

মঙ্গলের জন্য, নিজেদের শোধনের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁদের রক্ষার জন্য, তাঁদের অন্যায় অবিচার থেকে রক্ষা করার জন্যে এবং তাঁদের উর্দ্ধ গতির জন্যে ভগবান স্বয়ং আসেন।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

(গীতা ৪/৮)

অর্থাৎ, "সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ ও ধর্ম্মকে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।"

সুতরাং ভগবান যখন অবতীর্ণ হন সব অশুভ ক্ষমতা তখন বিনষ্ট হয়ে যায়, যেমন আলোর প্রভাবে অন্ধকার বিনষ্ট হয়। যে মুহূর্ত্তে শ্রীভগবান এই পৃথিবীতে আসেন তখনই সব অন্ধকার দূরে চলে যায়। তবে জীবাত্মারা ভগবানের তটস্থা শক্তি থেকে অবিরত উৎপন্ন হচ্ছে, সুতরাং এই মায়িক পৃথিবী আবার জীবাত্মায় পূর্ণ হয়ে যায়, কারাগার যেমন কখনও শূন্য থাকে না। প্রত্যেক বন্দী জীবাত্মার যখন কাল পূর্ণ হবে, যখন তাদের সময় হবে, তখন তারা একে একে এই কারাগার ছেড়ে চলে যাবে, তাদের সুখময়, সৌভাগ্যময়, চিন্ময়, সেবাময় জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে।

আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে যখন কোন পরাধীন দেশ স্বাধীনতা অর্জ্জন করে, তখন কারাগার থেকে

বন্দীদের কখনও কখনও মুক্তি দেওয়া হয়। অনেক সময় কোন দেশে যখন নতুন রাষ্ট্রপতি তাঁর পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর সম্মানেও অনেক অপরাধীদের ক্ষমা করা হয় বা বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে পৃথিবীতে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। কিন্তু এসবই যা আদি কারণ, তার ছায়া মাত্র। যখন শ্রীভগবান আবির্ভূত হন, তখন অনেক জীবাত্মা উদ্ধার পান এবং তাঁরা চিরকালের মত এই পৃথিবী থেকে চলে যান। কখনও তিনি নিজে আসেন, কখনও তিনি তাঁর কোন প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দেন। সেই প্রতিনিধি হলেন সাধু বা গুরু। তাঁরা এখানে আসেন জীবাত্মাকে শিক্ষা দিতে। "জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে। কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে।":—"হে জীবাত্মা তোমরা জেগে ওঠ, তোমাদের প্রকৃত স্বরূপকে চিনে নাও। তোমরা হলে দিব্য চেতনার অংশ আর সেই দিব্য চেতনার চিন্ময় ধামেই তোমাদের প্রকৃত গৃহ, প্রকৃত জীবন রয়েছে। সেখানে তোমরা সবই পাবে, তোমাদের বাড়ীঘর, পরিবার, সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুতি শুরু কর।" "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—এখানে উপনিষদে আমরা বৈদিক দর্শনই পাই। শাস্ত্র আমাদের বলছেন, "এই দুঃখময় পৃথিবীর মায়ানিদ্রা থেকে উঠে পড়। তোমার সৌভাগ্যের বরদানকে গ্রহণ করো। সাধুদের অনুসরণ কর।" আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি আর কোথায়

আমাদের গন্তব্য তাই তাঁরা আমাদের বলছেন—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" "ওঁ তৎ সৎ।" সমগ্র বিশ্বে এই বাণী ধ্বনিত হয়েছে।

চিন্ময় জগতে অণুচেতনা জীবের পূর্ণতা

চিন্ময় জগতই হল সত্য, শ্রীভগবানই হলেন পরম সত্য আর আমরাও তাঁর সঙ্গে সেই চিন্ময় জগতেরই বাসিন্দা। সেই জগতের প্রকৃতির সঙ্গেই আমাদের প্রকৃতির মিল আছে।

সূর্য্যের যে তেজময় জ্যোতি, তা সূর্য্যকিরণেও রয়েছে। সূর্য্যকিরণে সাতটি প্রাথমিক রঙও রয়েছে। তেমনি শ্রীভগবানের চেতনার স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ আমাদেরও চিন্তা, অনুভব ও ইচ্ছাশক্তি আছে। শ্রীভগবান হলেন পূর্ণচেতনা, আর আমরা হলাম অণুচেতনা। শ্বেতাশ্বতরোপণিষদে আত্মাকে বর্ণনা করা হয়েছে অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য বস্তু বলে।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্তায় কল্পতে॥

(৫/৯)

অর্থাৎ চিচ্ছক্তির অতি সূক্ষ্ম খণ্ডাংশসকল বিভিন্নাংশরূপে জীব হয়। জীবের মধ্যে যে সূক্ষ্ম শরীর বা আত্মা আছে তার মোটামুটি পরিমাণ আকার হল কেশাগ্রের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ। একটা চুলের মাথাকে দশ

হাজার ভাগে ভাগ করলে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকু হল আত্মার পরিমাণ। সুতরাং আত্মা হল অদৃশ্য। কিন্তু পরিমাণে ক্ষুদ্র হলেও তার ক্ষমতা, তার সম্ভাবনা বিরাট। হৃদয়ের বা হৃদ্‌যন্ত্রের গহন অভ্যন্তরে আত্মা তার সূক্ষ্ম শরীরে বাস করে এবং আজ পর্য্যন্ত তাকে কেউ দেখতে পায়নি। আজকাল কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে তাঁরা আত্মার অস্পষ্ট ছায়ার ফটো তুলতে পারেন, কিন্তু তবুও আত্মার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাপটা কিরকম, সেটা তাঁরা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি। দেহের যেমন একটা আবরণ আছে, আত্মারও তেমন একটি আবরণ আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে,

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥

(৩/৪২)

"পণ্ডিতগণ বলেন জড় বিষয় হতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়সকল হতে মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষাও নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। আবার যিনি বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তিনিই সেই (জীবাত্মা)।"

আত্মার অনেক সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর আবরণ আছে। দেহের আবরণের চেয়ে ইন্দ্রিয়ের আবরণ আরও সূক্ষ্ম; ইন্দ্রিয়ের আবরণের থেকে মনের আবরণ আরও সূক্ষ্ম; মনের থেকে বুদ্ধির আবরণ আরও সূক্ষ্ম; আর তার চেয়েও

সূক্ষ্ম যার আবরণ, সেই হল আত্মা। সুতরাং অনেক আবরণের স্তরের নীচে আত্মা বাস করে এবং আমাদের কাছে তার রূপ অজানাই থেকে গিয়েছে।

তবে যদিও আত্মা আকারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তবুও সে চেতনার অংশ এবং চেতনার যে তিনটি ক্ষমতা আছে অর্থাৎ চিন্তাশক্তি, অনুভবশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি—তা তার নিত্যকালই থাকবে। যার কোন একটা ক্ষমতা আছে সে সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারে, তা সে ভাল কাজই হোক আর মন্দ কাজই হোক। আত্মার যা ক্ষমতা আছে তা সত্যই বিরাট। একটা ক্ষুদ্র মোমবাতির আলো খুব ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র আলো থেকেই একটা বিরাট আগুন জ্বালানো যেতে পারে। একটা ছোট মোমবাতি থেকে একটা বড় মোমবাতি জ্বালানো যেতে পারে। তার থেকে আরও বড় একটা মোমবাতি জ্বালানো যেতে পারে। কিন্তু সেই বড় মোমবাতির আলোর আর ছোট মোমবাতির আলোর প্রকৃতি একই হবে। তাদের দহন শক্তি একই থাকবে। তেমনি আদিপুরুষ যে শ্রীভগবান তাঁর যেমন তিনটি গুণ আছে যা হল সৎ, চিৎ ও আনন্দ অর্থাৎ তিনি নিত্য, পূর্ণচেতনাময় ও আনন্দময়—সেই তিনটি গুণ আংশিকভাবে তাঁর অংশহিসেবে জীবাত্মার মধ্যেও আছে। কিন্তু আপাততঃ জীবাত্মা একটা আবরণের মধ্যে আছে। লাইটবাল্‌বের ভিতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু যে আগুনের

জন্যে আলোটা জ্বলছে তাকে লাইটবাল্‌বের বাইরে দেখা যায় না, তবে একটা তাপ অনুভব করা যায়। আবার ঠাণ্ডা আগুনও আছে, যেমন নিওন লাইট, যেখানে মনে হয় কোন তাপও নেই। এই মাইক্রোফোনের ভিতরে বিদ্যুতের অদৃশ্য আগুন কাজ করছে। সেই আগুন আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার ফল দেখে বুঝতে পারছি যে সে তার কাজ করে যাচ্ছে। এইভাবে যেখানে কোন একটা শক্তি আছে, সেখানে তার কাজ নানাভাবে হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং জীবাত্মার ক্ষমতাকেও ভাল মন্দ দুইভাবে ব্যবহার করা যায়। যখন কোন সৌভাগ্যবান জীবাত্মারা তাঁদের ক্ষমতাকে কোন ভাল কাজে লাগাতে চান, তখন কেউ যদি তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করেন তবে ভগবান নিজে এসে সেইসব বাধা ধ্বংস করে দেন। যাঁরা সজ্জন,তাঁদের উদ্দেশ্যও সৎ। শ্রীভগবান ভগবদ্গীতায় বলেছেন "আমি সাধুদের পরিত্রাণ করতে আসি আর দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করি।" একজনের সৎ ও শুভ ইচ্ছা যত কম, তার শাস্তিও ততবেশী হবে। আর যে শুভ প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তাকে ভগবান বিশেষভাবে সাহায্য করেন। "হ্যাঁ তুমি মঙ্গল চাও, শুভ চাও, তাই তুমি ধার্ম্মিক হবে। ধর্ম্মই তোমার নিজের সম্পদ, তোমার ঐশ্বর্য্য হবে। আমি তোমার কাছ থেকে কি নেব, আমি নিজের মধ্যে নিজে পরিপূর্ণ হয়ে আছি।" উপনিষদে বলা হয়েছে—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

"যিনি সকল অবতারের পরিপূর্ণ উৎস অবতারী ও যিনি পূর্ণ অবতার—তাঁরা দুজনেই পরিপূর্ণ অর্থাৎ সমস্ত শক্তি ও গুণাবলী তাঁদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় আছে। যিনি পূর্ণ অবতার তিনি পূর্ণ অবতারী থেকে আবির্ভূত তাঁর লীলা প্রকাশের জন্যে। তাঁর লীলা পরিপুষ্ট করার জন্য যিনি পূর্ণ অবতার তিনি পূর্ণ রূপে আসেন, আর যিনি পূর্ণ অবতারী তিনিও সেখানে বর্ত্তমান থাকেন, কোনরকমেই তাঁদের পূর্ণতার ক্ষয় হয় না। কারণ পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।" এসব বিষয় ধারনার অতীত, তাই তা অচিন্ত্য।

পরধামের বৈশিষ্ট্য

শাস্ত্রে শ্রীভগবানের সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি "নিজ-লাভ-পূর্ণ"—তিনি নিজের মধ্যে নিজে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁর কোন কিছুতে কোন প্রয়োজন নেই। তবুও তাঁর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাঁর লীলা কল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে। তবুও তাঁর লীলার মাধ্যমেই ভাগ্যবান ভক্তিমান জীবাত্মারা তাঁর কাছে নিজেদের নিবেদন করেন, সেবার দ্বারা এবং তিনিও তাঁর ভক্তদের সেবা করেন এবং প্রেমানন্দে নিজেকে তাদের মধ্যে বিতরণ করেন। ভক্ত ও

ভগবানের সেই বিনিময়ের মধ্যে ভগবানের যে আনন্দ হয়, তার দ্বিগুণ আনন্দ হয় তাঁর ভক্তদের। গোলোক বা পরব্যোমধামের এই হল বৈশিষ্ট্য।

পারমার্থিক রস বিচার

শ্রীভগবানের বিভিন্ন রূপ আছে এবং তাঁর প্রত্যেক রূপের নির্দ্দিষ্ট লীলা আছে যা তিনি উপভোগ করেন। জীবাত্মারাও তাঁদের শুদ্ধ ভক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলায় প্রবেশাধিকার পান। শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তদের যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে তার নানা স্তর আছে যেমন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। শুদ্ধ ভক্তরা তাঁদের হৃদয়ে ভক্তির যে রস অনুভব করেন সেই অনুযায়ীই শ্রীভগবানের নির্দ্দিষ্ট সেবা করেন। যাঁর হৃদয়ে দাস্যরস আছে তিনি দাসরূপে শ্রীভগবানের সেবা করেন, যাঁর হৃদয়ে বাৎসল্যরস আছে তিনি বাৎসল্যরসে শ্রীভগবানের সেবা করেন। আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি ভক্ত ভগবানের সেবা করেন, কিন্তু আমাদের এটা বোঝা উচিত যে ভগবানও তাঁর ভক্তদের সেবা করেন। যখন কৃষ্ণ মাখন চুরি করলেন তখন মা যশোদা লাঠি হাতে তাঁকে তাড়া করলেন। "তুমি মাখন চুরি করলে কেন? আমাদের তো মাখনের কোন অভাব নেই আর যত ইচ্ছা মাখন তুমি খেতে পার। তবে তোমার মাখন চুরি করার কি দরকার?" এই বলে মা যশোদা শিশু কৃষ্ণকে

দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধলেন। এইভাবে ভগবান তাঁর ভক্তের সেবা করেন তাঁর ভক্তের সন্তান হয়ে এসে। তাঁর মধুর রসের লীলা তিনি করেন গোপীদের সঙ্গে।

চিন্ময় ধামে এই পাঁচ রকমের রসের মাধ্যমে শ্রীভগবানের নিত্য সেবা অনন্ত কাল ধরে চলেছে। বৈকুণ্ঠ ধামে যেখানে তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে অবস্থিত সেখানে তাঁর নির্দ্দিষ্ট সেবা চলছে আবার যেখানে তিনি শ্রীরামচন্দ্র রূপে অবস্থিত সেখানে তাঁর সেইরকম সেবা চলছে। এইভাবে শ্রীভগবান বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন লীলা করছেন। কিন্তু আমরা যেখানে তিনি কৃষ্ণচন্দ্র হয়ে তাঁর নিত্যলীলা করছেন, সেই লীলাময়েরই পূজা করি। কারণ সেখানেই শ্রীভগবান তাঁর আদি ও পূর্ণ রূপে রয়েছেন এবং একমাত্র সেখানেই সর্ব্বরকমের রসের (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস) মাধ্যমে তাঁর পরিপূর্ণ সেবা সম্ভব, যা জীবাত্মাকে পরম ও সর্ব্বোচ্চ আনন্দ দেয়। সেই আনন্দ অন্য কোথাও সম্ভব নয়।

লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীভগবানের সখারা বলেন, "চল এখন খেলতে যাই। যে হারবে তাকে কিন্তু জিতে যাওয়া লোকটীকে কাঁধে তুলে নিতে হবে।" সুতরাং শ্রীভগবান খেলায় হেরে গিয়ে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাঁর সখাদের কাঁধে তুলে নেন। যখন

তাঁরা একটা সুস্বাদু ফলে কামড় দেন তখন আবার সেই উচ্ছিষ্ট ফলটি কৃষ্ণের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বলেন, "খেয়ে দেখ ভাই, কি মিষ্টি ফল !" এই রকমের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক কেবল কৃষ্ণলীলাতেই দেখা যায়, অন্য কোথাও দেখা যায় না। গোপীরা তাঁদের চিন্তা ও কাজের মধ্যে কৃষ্ণকে স্বামী রূপে বরণ করেছেন। সেইভাবেই তাঁরা তাঁর সেবা করেন। আমরা তো কৃষ্ণের দিব্যলীলার কথা শুনেছি আর তাঁর পবিত্র শ্রীনামও শুনেছি। এখন যদি কোনরকমে সেখানে একটু যোগাযোগ আমরা করতে পারি তবে আমরাও তাঁর এইসব লীলার মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ পাব। এই হল পরম ভক্তির পথ আর স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের সেবা এই পথেই করা যায়।

মধুরমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণনাম

শ্রীভগবানের এই "কৃষ্ণ" নাম কত মধুর। "কৃষ্ণ" অর্থাৎ যিনি সমস্ত জীবাত্মাকে আকৃষ্ট করে তাঁর পরমধামে নিয়ে যান এবং সেখানে তাদের পরম আনন্দ দেন। এই হলেন কৃষ্ণ।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

"'কৃষ' ধাতুতে পরম আকর্ষণীয় সত্তাকে বোঝায় আর 'ণ' হল সেই পরমানন্দ। এই দুইয়ের মিশ্রণেই 'কৃষ্ণ' নাম এসেছে —যা সেই পরমব্রহ্ম ও পরমসত্যকে বোঝায়।"

তিনি আমাদের সবাইকে আকর্ষণ করেন, কিন্তু তবুও তিনি কখনও আমাদের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেই স্বাধীনতাকে কেড়ে নেন না। এটা জীবাত্মার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দুইই। ভগবান সবাইকেই স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন, তাই শুরু থেকেই সকলেরই চিন্তাশক্তি, অনুভবশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে। কেন ভগবান আমাদের এই স্বাধীনতা দিয়েছেন? যাতে আমরা স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনতার সঙ্গে নিজেদের তাঁর সেবায় নিয়োজিত করতে পারি। যতটুকু আমাদের ক্ষমতা আছে, যতটুকু আমাদের বাসনা আছে, এবং যা কিছু আমাদের আছে সেইসব একত্র করেই আমরা শ্রীভগবানের সেবা করতে পারি।

শ্রীভগবানের ইচ্ছাটা এইরকম, "আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিয়েছি এবং তা আমি কেড়ে নেব না। তোমাদের যদি ইচ্ছা হয় আমার সেবা করার তা তোমরা করতে পার, তা না হলে তোমরা মায়ার অধীন থাক। যা তোমাদের ইচ্ছা তাই তোমরা করতে পার। কিন্তু আমাকে সেবা করলে তোমরা পরম সুখী হবে। কেন পরম সুখী হবে? কারণ যদি যিনি নিত্য ও অমৃতময়, তাঁর সেবা কর তবে অমৃত ফল পাবে; আর যদি অনিত্যের সেবা কর তবে অনিত্য ফল পাবে।"

যেমন বৈজ্ঞানিক নিউটন বলেছেন তাঁর "থার্ড ল"তে "প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে," তেমনি কৃষ্ণও বলেছেন "যদি আমার জন্যে কর্ম্ম কর তবে তোমার সব কর্ম্ম দ্বিগুণরূপে সম্পন্ন হবে।" যখন কৃষ্ণের কোন সখা একটা মিষ্টি ফল পান তিনি সেটা কৃষ্ণকে দিয়ে বলেন, "দেখ ভাই, এটা খেয়ে দেখ, তোমার খুব ভাল লাগবে।" তখন কৃষ্ণ সেই ফলে কামড় দিয়ে বলেন, "হ্যাঁ খুব মিষ্টি ফল বটে, কিন্তু আমি একা কি করে এটা খাই? তুমিও খাও আমার সঙ্গে।" তখন তাঁরা তুজনে পরম আনন্দে সেটা ভাগাভাগি করে খান। যমুনার তীরে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার কথাও আমরা শুনি। কৃষ্ণ সবাইকে আনন্দ দেন, এমনকি তিনি নিজেকে পর্য্যন্ত দান করেন। যদি কেউ অসুখী থাকেন, তাঁকে কৃষ্ণ দ্বিগুণ সুখ দেন।

গৌরকৃষ্ণের মাধুর্য্য-মর্য্যাদা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের যে উপলব্ধি দিয়েছেন তা হল সর্ব্বোচ্চ। আর সেই সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি হল 'বিরহমিলন'—বিরহের মধ্যে দিয়ে মিলনের উপলব্ধি। তার থেকেই পরম আনন্দ আসে। এই পৃথিবীতেও আমরা এমন কোন উপলব্ধির আভাস পাই যার সঙ্গে সেই পরম উপলব্ধির মিল আছে। যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে ছেড়ে

বহু দূর দেশে চলে যান এবং তিন চার বছর তাঁদের দেখা না হয় তাহলে তখন সেই স্বামী যখন আবার বাড়ী ফিরে আসবেন, তখন তাঁদের দুজনের কত আনন্দ হবে। তাঁদের দুজনের এই আনন্দ খুব সহজেই আমরা হৃদয়ে অনুভব করতে পারি।

দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের আনন্দ হল সর্ব্বোচ্চ আনন্দ। একমাত্র কৃষ্ণলীলাতেই এই আনন্দ পাওয়া যায়, আর কোথাও নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম দান হল এই যে আমাদের সবাইকেই সেই কৃষ্ণলীলায় প্রবেশের ও বৃন্দাবনে বাস করার সুযোগ পাওয়ার জন্যে একটা ব্যাকুলতা ও প্রেরণা তিনি আমাদের দিয়েছেন। সেই হল আমাদের পরম গন্তব্যস্থল যেখানে আমরা পাব বৃন্দাবনের চিন্ময় বৃক্ষলতা পরিশোভিত সুন্দর রমনীয় বনকানন, বনের ফুল, গাছের ফল, যমুনার জল, ময়ূর, গাভী, দুগ্ধ, দধি, ছানা, মাখন; যেখানে আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতে পারি, বনে বনে তাঁর সঙ্গে ছোটাছুটি করতে পারি, তাঁর সঙ্গে নিভৃত আলাপ করতে পারি, সবকিছুই করতে পারি তাঁর সঙ্গে। মূরলী কলকূজনে সকলকে আকর্ষণ করে তাঁর গভীর প্রেমের বন্যায় তিনি আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেন। কৃষ্ণলীলাই হল সেই পরম আনন্দদায়ক প্রেমপূর্ণ অমৃত ফল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গীতার জ্ঞান

আমি যখন সতেরো বছরের একটি অল্পবয়স্ক ছেলে ছিলাম তখন ১৯৪৭ সালে আমি শ্রীল গুরুমহারাজের কাছে আসি। তখন শ্রীল গুরুমহারাজ আমাকে বলেছিলেন, "আমি সবসময় কলকাতায় থাকব না, সেজন্যে তুমি স্বামী মহারাজের (শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ) কাছে ভগবদ্গীতা পাঠ কর।"

শ্রীল স্বামী মহারাজ যখন গীতা পড়তেন তখন তিনি তা অনুবাদ করতেন এবং একই সঙ্গে আমাকেও পড়াতেন। সেই সময় আমরা শ্রীল স্বামী মহারাজের বাড়ীতে থাকতাম। এটা তাঁর সন্ন্যাস নেবার আগের কালে। শ্রীল গুরুমহারাজ আর শ্রীল স্বামী মহারাজ দুজনে খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমার বয়স ছিল সতেরো আর শ্রীল স্বামী মহারাজের ছেলের একই বয়স ছিল, তাই আমরাও পরস্পরের বন্ধু ছিলাম। মাঝে মাঝে আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও করতাম।

প্রত্যেকদিন আমি তখন বড় বাজারে যেতাম প্রচারের জন্যে আর সেখানে নানারকমের প্রশ্ন আমাকে শুনতে হত,

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, "তুমি বৈষ্ণব হলে কেন? এই রকম জীবনের কি মূল্য আছে? তুমি ইস্কুলের পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে সাধু হয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছ কেন?" এই ধরনের প্রশ্ন অনেকেই করতেন। একটা প্রশ্ন যেটা প্রায়ই শুনতাম সেটা হল "তুমি মা কালীর পূজা কর না কেন? তাঁর পূজা করলে তিনি তোমাকে সব দেবেন। খালি তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, 'ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি' ইত্যাদি। তাহলে তুমি সবই পাবে, ধনদৌলত, রূপ, পরিবার, সম্মান, সব। মা কালীর পূজা করে যদি সব পাওয়া যায় তবে মা কালীর পূজা কর না কেন? কৃষ্ণের পূজা কেন কর?" তাঁরা যা বলছেন তা ঠিক বলছেন কিনা আমি তা জানতাম না, তাই তার যথাযথ উত্তরও দিতে পারতাম না। বাড়ী ফিরে এসে শ্রীল স্বামী মহারাজকে এসব কথা বলতাম। আসলে আমি তাঁকে প্রত্যেকদিনই সেদিন কি ঘটেছে না ঘটেছে তা জানাতাম।

তাই আমি যখন তাঁকে বললাম মা কালীর ভক্তরা আমাকে কিভাবে জেরা করেছে তখন তিনি বলতেন, "তুমি একদম বোকা। কিছু একটা উত্তর কি তুমি তাদের দিতে পারতে না? তুমি কৃষ্ণভক্ত, তুমি কৃষ্ণের পূজা কর, সেটা তো স্বাভাবিক। আর তারা মা কালীর ভক্ত, তারা মা কালীর পূজা করে সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের ঐ পথ থেকে এ পথে আনার জন্য কিছু একটা কি তুমি বলতে পারতে না?"

আমি বললাম, "আমি আর তাদের কি বলব? তারা তো আমাকে বলল মা কালীর পূজা করলেই ধনদৌলত, মান-সম্মান, পুত্র-পরিবার সবই পাওয়া যায়।"

তখন শ্রীল স্বামী মহারাজ বললেন, "তারপর শেষপর্য্যন্ত তোমার মৃত্যু হবে কিনা ?"

"সে তো ঠিকই। সবাইকেই তো একদিন মরতে হবে। আমরাও তো তার থেকে রেহাই পাবো না।"

"তা ঠিক। কিন্তু যদি তুমি নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণের ভজনা কর তবে অন্তিমে তুমি কৃষ্ণলোকে আশ্রয় পাবে। ঠিক কিনা ?

"হ্যাঁ তা ঠিক। যদি আমরা আন্তরিকভাবে কৃষ্ণের ভজনা করি তবে তাঁর কৃপা নিশ্চয়ই পাবো আর তাঁর কৃপা পেলেই কৃষ্ণলোকে যেতে পারবো।"

তখন শ্রীল স্বামী মহারাজ আমাকে বোঝলেন, "আর মা কালীর পূজা করলে মৃত্যুর পর তোমার কি গতি হবে? তাঁর সেবা করলে যদি তিনি তোমার উপর সন্তুষ্ট হন তবে তুমি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের একজন হবে। তখন তুমি কোথায় যাবে আর তাতে তোমার কি লাভ হবে? হয় তিনি শ্মশানে থাকেন অথবা মহাদেবের সঙ্গে শান্তিতে হিমালয়ে থাকেন। তা সেখানে তো বরফের মত ঠাণ্ডা। তুমি যদি শ্মশানে তাঁর পার্ষদ হও তাহলে আর একটা মুশকিল আছে। কি রকমের দেহ তুমি সেখানে ধারণ করবে? তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা তো

সকলেই সেখানে ভূতপ্রেত, ডাকিনী, শাঁখিনী ইত্যাদি। সেখানে তাঁর দুটি পুত্রও আছে ঐরূপে আর তোমাকেও সেখানে ঐরূপে থাকতে হবে। এখানে তুমি যে ধনদৌলত, পরিবারের জন্য প্রার্থনা করবে তা যে পেলেও পেতে পার তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার পূজায় তিনি সন্তুষ্ট হলে শেষপর্য্যন্ত তোমার কি গতি হবে? সেটা তো ভাবতে হবে! মা কালীর আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে—তিনি নগ্ন হয়ে থাকেন। যদিও শিল্পীরা তাঁকে বেশভূষায় সজ্জিত করে তাঁর ছবি আঁকেন, কিন্তু শাস্ত্রে আছে যে তিনি নগ্ন হয়ে থাকেন। তিনি নিজেকে হাত দিয়ে ঢেকে রাখেন। কার হাত? তাঁরই নিজের সন্তানদের হাত। তুমি তাঁকে 'মা' বলে ডাক—তো তিনি কার মা? তিনি তোমারই মা। তিনি পাপী লোকদের হাত কেটে সেই হাত নিজের পরিচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি তাদেরই আকৃষ্ট করেন, তাদের মুণ্ডু কাটেন আর সেই খুলির মালা গলায় পরেন। এতে তোমার কি মঙ্গল হবে? তাঁর ভক্ত হয়ে শেষপর্য্যন্ত তোমাকে ভূতপ্রেত হয়ে তাঁর সঙ্গে বাস করতে হবে!"

এই ছিল স্বামী মহারাজের উত্তর। তখন তিনি আমাকে বললেন, "তুমি এরকম উত্তর দিতে পারতে না ?"

আমি বললাম, "আমি ওদের এসব কথা বললে তো ওরা আমাকে ধরে মারবে। তখন ওরা বলবে, "এসব তুমি কি প্রচার করছ?"

ব্রজলীলা—ভগবৎ উপলব্ধির পরাকাষ্ঠা

তখন শ্রীল স্বামী মহারাজ বললেন, "তাহলে তুমি ওদের বলতে পারো, "ঠিক আছে, খুব ভাল কথা। তোমরা মা কালীর সন্তান হতে পারো, কিন্তু আমার ওতে কোন উৎসাহ নেই। আমরা বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সঙ্গে থেকে দুধ-দই-ছানা-মাখন এসব প্রসাদ পেতে চাই। আর সেখানে তাঁর যে লীলা চলছে যমুনা-লীলা, রাস-লীলা তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাই। কোনটা তোমরা বেশী পছন্দ করবে, এইটা না ওইটা ? যা তোমাদের বেশী পছন্দ তাই তোমরা বেছে নাও। এটা তোমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত।"

এমনি করে শ্রীল স্বামী মহারাজ খুশীমনে—আমি যখন ছেলেমানুষ ছিলাম—আমার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতেন। সাধারণ লোকের যুক্তি ছিল এই যে "আমরা ধনদৌলত পুত্র পরিবার সবই লাভ করতে পারি।" আর স্বামী মহারাজের যুক্তি ছিল এই যে, হ্যাঁ পেতে হয়ত সবই পারো, কিন্তু কিছুই শেষপর্য্যন্ত তোমার থাকবে না। সবই একদিন হারাতে হবে। তারপর মা কালীর ভক্ত হলে তাঁর সঙ্গেই থাকতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণের সত্যিকারের ভক্ত হলে আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে বাস করতে পারবো। তাঁর স্বধামে আমরা পৌঁছতে পারব।"

ভগবৎ রসের বৈচিত্র্য

সুতরাং কৃষ্ণলোক হল কৃষ্ণের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ দিব্যলীলার স্থান। সেখানে চিন্ময় সম্বন্ধের যে মুখ্য রস—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর মধুর—তাদের কেন্দ্র করে তাঁর সর্ব্বোত্তম লীলাকল্লোল বারিধির তরঙ্গ চলেছে।

নারায়ণলোক বা বৈকুণ্ঠলোকে যে লীলা চলে সেখানে আড়াইখানি রস পাওয়া যায়, শান্ত রস দিয়ে শুরু করে, তারপর দাস্য রস, তারপর সখ্য রসের অর্দ্ধেক। নারায়ণের সখার কথা শাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। সকলেই সেখানে তাঁর অনুগত, শ্রদ্ধাশীল সেবক। কারোর কারোর মধ্যে অর্দ্ধেক সখ্য রস মাত্র পাওয়া যায়। যেমন লক্ষ্মীদেবী, নারায়ণের সহচারিণী। তিনি নারায়ণের কাছে সবসময়ই হাতজোড় করে আছেন, "প্রভু আপনার কি আদেশ ?"

তিনি কখনই সখীর মত তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ব্যবহার করতে পারেন না, বা তাঁকে বকাবকি করে বলতে পারেন না, "কৃষ্ণ তুমি যাও এখান থেকে !" পরমেশ্বর যখন বৈকুণ্ঠে তাঁর নারায়ণ রূপে আছেন, তখন সকলেই তাঁর সামনে দাস্যভাবে শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়ে আছেন। কিন্তু কৃষ্ণলোকে তা নয়। সেখানে হয়ত মা যশোদা কৃষ্ণের কান ধরে টানছেন অথবা তাঁকে বকাবকি করছেন "আবার তুমি কি দুষ্টুমি করেছ ?" আর কৃষ্ণও সেখানে তেমনিভাবে তাঁর ছেলে হয়ে খেলা করছেন।

গোপীরা মা যশোদার বাড়ীতে এসে কৃষ্ণের নানা দুষ্টুমির কথা তুলে নালিশ করতে এলেন। তাঁরা মা যশোদাকে গিয়ে বললেন, "তোমার ছেলে আমাদের বাড়ী এসে নানারকমের দুষ্টুমী করে। সে কোন না কোনরকমের ঝামেলা করবেই আর আমাদের দুধ দই মাখন সব তার অত্যাচারে নষ্ট হয়ে যায়।"

তখন কৃষ্ণ সব অস্বীকার করেন, "না না দেখ আমার হাত দেখ। আমি ওদের দুধ দই মাখন কিছু ছুঁয়েও দেখিনি। তা নাহলে তুমি তার গন্ধ পেতে। আমি তো কেবল তুমি আমাকে যা খেতে দিয়েছ তাই খেয়েছি। এরা সব মিথ্যে কথা বলছে!"

মা যশোদা তখন জিজ্ঞেস করেন, "তা এরা শুধুশুধু তোমার নামে মিথ্যে কথাই বা বলতে যাবে কেন?"

কৃষ্ণ তখন বলেন, "আসলে এরা এখানে আসে আমাকে দেখতে। সেটাই আসল কারণ। তা তোমাকে তো সেকথা বলতে পারে না! তাই এসব মিথ্যে নালিশের অজুহাত নিয়ে আসে!"

গোপীরা তাই শুনে হাসাহাসি করেন, কৃষ্ণও তাই দেখে হাসেন। মা যশোদাও হেসে ব্যাপারটা ওখানেই মিটিয়ে দেন। তারপর গোপীরা যখন বাড়ীমুখো হাঁটতে থাকেন, তখন হঠাৎ কৃষ্ণ পিছন থেকে এসে হাজির হন আর তাদের বলেন, "কি ভেবেছ কি তোমরা? আমার মার কাছে গিয়ে

আমার নামে নালিশ করে ঝামেলা পাকিয়েছ! এখন আমি তার প্রতিশোধ নেব, তোমাদের সকলের কাছে আসব তোমাদের স্বামী হয়ে। তখন কি করবে?”

এইরকম হল কৃষ্ণলোকের লীলা। কিন্তু কৃষ্ণের এই লীলা শ্রীভগবানের অন্য কোন রূপে দেখা যায় না। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শ্রীরামচন্দ্রের কথা, তিনিও তো স্বয়ং ঈশ্বর, পূর্ণব্রহ্ম, পুরুষোত্তম ভগবান, এই পার্থিব জগতের অতীত তাঁর চিন্ময় স্বরূপ। কিন্তু তিনি তাঁর লীলায় কি দেখান? তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিয়মের মধ্যে থাকেন। বেদের বিধি ও বিধানকে তিনি পূর্ণ মর্য্যাদা দেন। তিনি কখনও কোন নিয়মভঙ্গ করেন না, সেদিকে তিনি অচ্যুত। সর্ব্বদাই তাঁর এই ব্যবহার। সেজন্যে তিনি “মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম” নামে বিখ্যাত। যদিও তিনি স্বয়ং ভগবান তবুও এই লীলায় তিনি তাঁর একটা বিশেষ দিককে প্রকাশ করেন। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয়েও তিনি বেদের বিধি-বিধানের সম্পূর্ণ অধীনে থাকেন। যখন তাঁর কানে এল যে লোকে বলাবলি করছে, “আপনার স্ত্রী অন্যের গৃহে বাস করেছেন”, তিনি সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী সীতাদেবীকে বনে নির্ব্বাসিত করলেন। সুতরাং এই অবতারে শ্রীভগবান তাঁর নিয়মের অধীনে থাকার প্রকৃতিকে প্রকট করেন।

কৃষ্ণলীলায় পূর্ণ প্রেমবিকাশ

কিন্তু কৃষ্ণের কাছে নিয়মকানুনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। নিয়মকানুনের প্রশ্ন কখনও তাঁর চিন্তাতেও আসে না। এই লীলায় তাঁর স্বাধীনতা হল সর্ব্বোচ্চ আর সেখানে প্রেম, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যের পরম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এ জগতে বা এ জগতের বাইরেও যতটুকু আমাদের ধারণায় আসতে পারে, তার চেয়েও অনেক বেশী প্রেমভালবাসা যা হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়, যে সৌন্দর্য্য কল্পনার অতীত, আর যে তীব্র আকর্ষণের কথা আমাদের এখনও জানা নেই—এ সবেরই পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় কৃষ্ণলীলায়।

যখন কৃষ্ণ এই পৃথিবীতে স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন তখন তিনিই নিজেই ঘোষণা করলেন যে "আমিই পরমেশ্বর"। ভগবদ্গীতায় সর্ব্বত্রই আমরা সেটা দেখতে পাই।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

(১৮/৬২)

"হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার কৃপায় পরম শান্তি ও নিত্যধাম লাভ করিবে।"

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

(৯/৩২)

"হে পার্থ! যাঁহারা অন্ত্যজাদির বংশে উৎপন্ন, স্ত্রীজাতি, বৈশ্যজাতি বা শূদ্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করিযাছে, তাহারাও আমাকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া উত্তমগতি লাভ করে।"

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

(১৮/৬৬)

"সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও।"

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

(১৮/৬৫)

"তুমি আমারই চিন্তা কর, আমারই সেবা কর, আমারই পূজা কর ও আমাকেই আত্মনিবেদন কর।"

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

(৭/১৪)

"এই ত্রিগুণময়ী অলৌকিকী আমার মায়াশক্তি অতীব দুরতিক্রমণীয়া, তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমারই শরণাগত হন, তাঁহারাই এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন।"

এখানে শ্রীভগবান মায়ার সম্বন্ধে বলছেন "এই যে মোহিনী শক্তি এ আমারই মায়া সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কেউ যদি আমাতে আত্মসমর্পণ করে তবে আমি তাকে এই মায়া থেকে মুক্তি দেব। শুধু তাই নয় তাদের আমি আমার

লীলাতেও প্রবেশের অধিকার দেব। সে ক্ষমতা আমারই আছে। কারণ আমিই ভগবান।”

ত্রিকালসত্য ভগবানের স্বঘোষণায় নিজ অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ

সেইসময়ে কৃষ্ণ এইভাবে তাঁর নিজের সম্বন্ধে বহু কথা বলেছিলেন, কিন্তু তখন কোথাও কেউ ছিল না যে তাঁর বিরোধিতা করেছে। আগেই আমরা বলেছি যে ভগবানের অনেক রূপ আছে, যেমন রাম, নৃসিংহ, বামন ইত্যাদি। তিনি যখন যে লীলা করেন সেই লীলার প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন-রূপ ধারণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণলীলা এতই অপূর্ব্ব ও উচ্চস্তরের লীলা যে সেখানে শ্রীভগবান নিজের ইচ্ছেমত নিয়ম করেন, ইচ্ছেমত নিয়ম ভাঙ্গেন, কোন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সেই রূপে তিনি তাঁর চিন্ময় নিত্যলীলা উপভোগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বলা হয়েছে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

(১/৩/২৮)

“পূর্ব্বে যে সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী-মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, অবতারগণের মূলপুরুষ।”

কৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর

ভগবানের অসংখ্য অংশ এবং অংশাংশ আছে, তাঁরা সকলেই পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। তবুও কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান ও আদিপুরুষ। তাই কৃষ্ণ তাঁর স্বয়ংরূপে তাঁর সর্ব্বোত্তম লীলা করেন, তখন তিনি প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বাস করেন। তাই বৈষ্ণবধর্ম্মের পারমার্থিক নীতি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে—"জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০/২৫)। সেই জীব যদি আমাদের পুত্র হয় তাকেও আমাদের দণ্ডবৎ প্রণাম করতে হবে, কিন্তু সেটা মনে মনে করতে হবে। তা না হলে তাতে সন্তানের মঙ্গল হবে না, কারণ সে ভাবতে পারে "আমার বাবা যখন আমাকে প্রণাম জানচ্ছেন তখন আমি নিশ্চয়ই তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" কিন্তু তাকে আমরা মনে মনে সম্মান দেব এই ভেবে যে ভগবান তার হৃদয়ে বাস করছেন। এই হল আমাদের নীতি।

শ্রীগীতার অমূল্য শিক্ষা

আজ আপনারা সবাই এখানে সমবেত হয়েছেন ভগবানের বাণী শোনার জন্যে। ভগবান স্বয়ং হলেন আপনাদেরই নিজস্ব ধন আর তিনি মহা গৌরবের সঙ্গে আপনাদের হৃদয়ে বাস করছেন। তাঁর বহু বহু রূপ আছে

আর তাঁর দিকে এগোবার জন্যেও বহু বহু পথ আছে, কিন্তু ভক্তিই হল চরম পথ। শ্রীভগবান ভগবদ্গীতায় যে অমূল্য পারমার্থিক জ্ঞান বিতরণ করেছেন, তার সম্মান পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে। কেন? না, এখানে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা সকলেরই জন্যে। গ্রন্থটি এমনিতে খুবই সংক্ষিপ্ত—মাত্র ৭০০ শ্লোক আছে এতে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১৮০০০ শ্লোক আছে আর মহাভারতে ১০০,০০০ শ্লোক আছে। পদ্মপুরাণও ১০০,০০০ শ্লোক সমন্বিত একটি বৃহৎ গ্রন্থ।

যদিও গীতায় মাত্র ৭০০টি শ্লোক আছে, তবু সারা পৃথিবীতে তার খুবই আদর আছে। গীতায় কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী, সকলেই নিজের নিজের অধিকার-সম্মত বা রুচি-অনুকূল মার্গ খুঁজে পান, আর যিনি ভক্ত তাঁর তো কথাই নেই। এমনকি যে নাস্তিক ও অরাজকতায় বিশ্বাস করে, হয়ত দেখা যাবে তারও পকেটে একখানি গীতা আছে, কারণ সেখানে অনাসক্তির পথও পরিষ্কার ভাবে দেওয়া আছে। যে জ্ঞান গীতায় দেওয়া হয়েছে তা এখন সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং সর্ব্বত্র তা সম্মান পাচ্ছে, এমনকি রাশিয়াতেও। এই পৃথিবীতে যারা কর্ম্মী, শ্রীভগবান সেখানে তাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা বলেছেন:

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

(৩/৮)

"তুমি নিত্যকর্ম্ম করিতে থাক, যেহেতু কর্ম্মত্যাগ দ্বারা যখন শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না, তখন অনধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ।" এবং সেই কর্ম্ম সম্বন্ধে বলেছেন:

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

(৩/৯)

"ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মকে যজ্ঞ বলে। হে অর্জ্জুন! সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য যে সকল কর্ম্ম করা যায়, সে সমুদায়কেই 'কর্ম্মবন্ধন' অর্থাৎ সংসার বন্ধনের কারণ বলিয়া জানিবে। অতএব তুমি কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্যে সমুদয় কর্ম্ম আচরণ কর।"

কথা হচ্ছে কর্ম্ম এমন ভাবে করতে হবে যাতে সেই কর্ম্ম বন্ধনের কারণ না হয়। বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়াই আমাদের লক্ষ্য, সুতরাং সেই লক্ষ্যে যাতে পৌঁছতে পারি সেইভাবেই আমাদের কর্ম্ম করতে হবে। যেমন কোন ভারতীয় কবি বলেছেন, জন্মের সময়ে শিশু কাঁদে কিন্তু আর সকলেই তখন হাসে। শিশুর জন্মকালে সবাই খুশীমনে বলাবলি করে, "অমুকের বাড়ীতে একটি শিশু জন্মেছে, কত আনন্দের খবর। ছেলে না মেয়ে? কি সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট শিশু! দেখ কেমন কাঁদছে!" জন্মের সময় শিশু কাঁদা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। কিন্তু আর সকলে তখন হাসে। কিন্তু জীবনে এমন কর্ম্ম করে

যেতে হবে যে যাবার সময়ে তুমি নিরাসক্ত হয়ে চলে যেতে পারবে আর সবাই তখন তোমার জন্যে কাঁদবে। সেরকম কর্ম্মও কিছু আছে আর তা হল শ্রীভগবানের পাদপদ্মের সেবা।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥
(৯/২৭)

"হে কৌন্তেয়! তুমি লৌকিক বা বৈদিক যে সকল কর্ম্ম কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যে ব্রতাদি কর; সে সমুদয়ই আমাতে যেভাবে অর্পিত হয় সেরূপ কর।"

কৃষ্ণ বলছেন, "এইভাবে যদি আমারই জন্যে সমস্ত কর্ম্ম কর তাহলে এই পৃথিবীতে তোমার কোন বন্ধন থাকবে না। আমি কে? আমি বিষ্ণু, আমিই পরমেশ্বর। "যজ্ঞার্থৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"। বিষ্ণুর অপর নাম যজ্ঞ, সুতরাং বিষ্ণুর জন্য যদি তুমি কর্ম্ম কর তাহলে সাফল্যের আশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই পাবে। তখন তুমি যাই করবে তাই শুভ হবে।

তোমার চিন্তাধারা যেন এরকম হয়, "আহা! আমার বাগানে কত ফুল ফুটে আছে, কিন্তু তারা সব মাটিতে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। আমি যদি গাছ থেকে এই ফুলগুলো তুলে ভগবানকে নিবেদন করি তাহলে তারাও আমার পূজনীয় হবে আর তখন আমি তাদের নিয়ে আমার মাথায় ঠেকাতে পারবো।"

সেইরকম আমরা দেখি আমাদের চলার পথে কত ঘাস আছে, আর প্রতিদিন আমরা তাদের পায়ের নীচে মাড়িয়ে চলি। কিন্তু কোন পবিত্র ঘাস যদি ভগবানের পূজায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে তখন তা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় ঠেকাই।

তাই শ্রীভগবান আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছেন, "সবকিছুই আমারই সেবা, আমারই পূজার জন্য ব্যবহার কর। তোমার বুদ্ধিকে সেবায় পরিণত কর, তাহলে তোমার সব বন্ধন তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে আর তখন এই পৃথিবীতেই তুমি সত্যিকারের সুখ খুঁজে পাবে। যার হৃদয় নির্ম্মল হয়েছে সে এই সংসারের সুখ-দুঃখ সবই সহ্য করতে পারে। যার সত্যিকারের চেতনা হয়েছে সে এই সংসারের কোন কিছুর জন্যে শোক করে না।"

আমাদের জীবনের প্রকৃত সমন্বয়

এইভাবে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমরা আমাদের জীবনে প্রকৃত সমন্বয় সাধন করতে পারবো। যে কেউ আমাদের বাড়ীতে এসেছে, আমাদের ছেলে বা মেয়ে হয়ে, আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে যথাসাধ্য তাদের যত্ন নেওয়া। আমাদের অবশ্যই মনে করা উচিত যে ভগবান তাদের আমাদের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন, সুতরাং আমাদের নিশ্চয়ই তাদের সেবাযত্ন করা উচিত। আর যদি তাদের এক বা

একাধিক জন হঠাৎ মারাও যায়, তবুও আমরা শোকার্ত্ত হবো না এই ভেবে যে ভগবানই তাদের টেনে নিয়েছেন।

সবকিছুই এবং সকলেই ভগবানেরই ধনসম্পত্তি। যা কিছু আমরা খাবো তা প্রথমে তাঁকে নিবেদন করে তারপর তাঁর অমৃতময় উচ্ছিষ্টকে প্রসাদ জেনে গ্রহণ করবো। যদি কাউকে কিছু দিই তাও প্রথমে ভগবানকে নিবেদন করবো, তারপর তাঁর ভক্তকে সেটা দেব তাঁরই সেবা করার জন্যে।

এইভাবে যদি আমরা আমাদের স্বাভাবিক নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন যাপন করি, তাহলে আমরা যা করবো তাই শুভ হবে। যখন আমরা কৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করি, তখন আমরা যাই করি না কেন, তা পারিবারিক জীবনেই হোক বা তার বাইরেই হোক, তার কেন্দ্রে থাকেন ভগবান।

ঈশ্বর-কেন্দ্রিক জীবন

যখন এই দৃশ্যমান জগত সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে বলে মনে করা হয় তখন যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষাটা ব্যবহার করা হয় সেটা হল 'সূর্য্যকেন্দ্রিক'। আর যখন পৃথিবীকেই কোন কিছুর কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করা হয় তখন তার সম্বন্ধে বলা হয় 'ভূ-কেন্দ্রিক'। কিন্তু আমাদের জীবনকে আমাদের 'ঈশ্বরকেন্দ্রিক' করে তুলতে হবে। আমাদের প্রয়োজন হল

তাঁকে আমাদের পরিবারের মধ্যে, জীবনের মধ্যে নিমন্ত্রণ করে আনা। যদি আমরা যা কিছু করি সেটা প্রথমেই তাঁকে স্মরণ করে, তাঁকে নিবেদন করে করি, তাহলে আমাদের সব কাজই নিঃস্বার্থ হবে। শুধু তাই নয় তখন তা পারমার্থিক হবে। কোন অশুভ জিনিস আর সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না, সব কিছুই শুভ হবে। এই হল ভগবানের সেবা : "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥" (গীতা ৪/৩৩)—"হে পার্থ! সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে।" তার মানে জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি হল ভক্তি।

ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

(গীতা ৬/৪৬-৪৭)

"পরমাত্মার উপাসনাকারী যোগী তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মের উপাসক জ্ঞানিগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহাই আমার অভিমত জানিবে। হে অর্জ্জুন, অতএব তুমি যোগী হও।"

"যিনি ভক্তিনিরূপক শাস্ত্রে বিশ্বাসযুক্ত এবং আমাতেই

আসক্ত মনের দ্বারা আমাকে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যোগে ভজনা করেন; সেই ভক্ত সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত।"

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥

(গীতা ৭/১৯)

"বহু বহু জন্মের পরে জ্ঞানী ব্যক্তি সমগ্র চরাচর বিশ্বই বাসুদেবময় বা বাসুদেবাধীন এরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া আমাতে শরণাগত হন। সেরূপ মহাত্মা অতি দুর্ল্লভ জানিবে।"

আত্মনিবেদনে সেবানিষ্ঠ জীবন

ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান এইরকমের শিক্ষা দিয়েছেন। প্রধান কথা হল যে তুমি নিজেকে তাঁর কাছে নিবেদন কর। তাঁকে বহুদূরে কোন সিংহাসনে বসিয়ে দূর থেকে কখনও কখনও কিছু নিবেদন করাটা কোন কথা নয়। তিনি তো সর্ব্বদা তোমার হৃদয়েই আছেন। তিনি তোমার মন্দিরে আবির্ভূত হন—তিনি সমস্ত জীবের মধ্যেও বাস করছেন। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বাস করছেন (বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি)। এইটা জানলেই তুমি জানবে তাঁর জন্যে তোমার কিসের প্রয়োজন আছে। তা হল ভক্তি ও সেবা—পারমার্থিক জগতে যারা ক্রীতদাস তারা যে সেবা চায়। 'ভক্তি'—এই

সংস্কৃত শব্দটা এসেছে ‘ভজ্’ ধাতু থেকে—“ভজ্-ধাতুঃ সেবায়াম্” । ভজ্ ধাতুর মূল অর্থ হচ্ছে সেবা । সুতরাং আমরা সেই সেবাপরিপূর্ণ জগতে বাস করতে চাই ।

শোষণের জগতের সমাধান

শাস্ত্র আমাদের বলেন যে আমরা এখন একটা শোষণের জগতে বা স্তরে বাস করছি । এখানে যদি আমরা কোথাও একটা গর্ত্ত খুঁড়ি তবে সেই মাটিটা অন্য কোথাও ফেলতে হবে, সেখানে বহুজিনিসকে চাপা দিয়ে একটা ঢিবির সৃষ্টি করতে হয় । এই উদাহরণটা এই সংসারের একটা যথাযোগ্য উপমা । এখানে আমাদের নিজেদের ভরণপোষণের উপায় খুঁজতে হয়, শরীরকে পালন করতে হয় এবং তার জন্য অবশ্যই আমাদের কোন না কোনভাবে প্রাণীহিংসা করতে হয় । শাস্ত্র আমাদের নির্দ্দেশ দিয়েছেন প্রাণীহত্যা না করতে, বিশেষ করে মাছ-মাংস না খেতে । তবুও বেঁচে থাকার জন্য কিছু তো আমাদের খেতেই হবে ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে আমাদের বাগানে হয়ত ভাল ভাল ফলমূল, শাকসব্জি হয়ে আছে—কিন্তু আমরা কি করে তা খাবো ? প্রথমে আমাদের শাকসব্জী, ফলমূলগুলোকে কাটতে হবে, কিন্তু সেটাও তো একরকমের প্রাণীহিংসা, কারণ একটা ফলের মধ্যেও তো

কোটি কোটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব বা অনুচৈতন্য ঘোরাফেরা করছে। এই যে দই খেতে আমার এত ভালবাসি, যাকে এত যত্ন করে জমাই তাকেও তো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ধরলে দেখতে পাবো তো একদম জীবন্ত জীবাণুতে পরিপূর্ণ।

তাহলে তুমি কি খাবে? শুধু জীবাণু? যাই খাও না কেন তুমি, তোমাকে অন্য প্রাণী হত্যা করতে হবে। আর যদি খাওয়াদাওয়া একেবারেই ছেড়ে দাও, তাহলেও তোমাকে নিঃশ্বাস নিতে হবে, তা না হলে তুমি বাঁচতে পারো না। কিন্তু প্রত্যেকবার শ্বাস নেওয়ার সময়ে লক্ষ কোটি জীবাণু তোমার শরীরে প্রবেশ করে। সুতরাং আমাদের ক্ষমতা নেই অন্য কোন ভাবে নিজেদের লালনপালন করা। সেজন্যেই এই সংসারকে শোষণের ভূমি বলা হয়েছে। অন্যকে হত্যা না করে আমরা এখানে বাঁচতেই পারি না। তাই প্রাণীহিংসা আমরা অবশ্যই করে থাকি।

কিন্তু শাস্ত্র বলছেন "তুমি নিজের হিসেবের খাতা, নিজের জমার খাতা কেন রেখেছ? এটা তোমার প্রয়োজন নেই।" যদি দুতিনজন পুলিশের লোক ডাকাতদলের পিছনে ধাওয়া করে আর তাদের ধরতে না পারে, তাহলে হয়ত তারা দরকার হলে গুলিও চালাবে। হয়ত দু-একজন তাতে মারাও পড়তে পারে, আর দু-একজন আহতও হতে পারে, কি করা যেতে পারে? অপরাধীকে ধরতে গিয়ে হয়ত একজন পুলিশ আহত

হবে অথবা তাকে নিজের জীবনও দিতে হতে পারে। তার ফল কি হবে?

এই সমস্ত দায়িত্বই সরকারের ঘাড়ে তাদের হিসেবের খাতায় জমা হবে। অপরাধীকে ধরতে গিয়ে যে পুলিশ আহত হয়েছে, তার পদোন্নতি হবে, তার বেতনও বাড়বে। তার চিকিৎসার জন্যে যা দরকার সবই দেওয়া হবে তাকে। আর যদি সে পঙ্গু হয়ে বাকি জীবনটা আর কাজে আসতে না পারে তাহলে তাকে ডাবল পেন্‌সন দেওয়া হয় তার ক্ষতিপূরণ করার জন্যে। কোন না কোনভাবে সে অবশ্যই পুরষ্কৃত হবে।

কিন্তু তুমি যদি নিজে নিজে কাউকে হত্যা কর তবে তোমাকে তখনি গ্রেপ্তার করা হবে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধের দায়ে। কিন্তু কোন নিরপরাধ ব্যক্তিও যদি পুলিশের গুলিতে মরে—যে পুলিশ অপরাধীকে ধরার চেষ্টা করছে—তবে তার সব দায়িত্ব সরকার নেন।

কিন্তু যার ক্ষমতা নেই অন্যকে শোষণ না করে বা কষ্ট না দিয়ে বেঁচে থাকার, তার নিজেকে এই দায়িত্ব থেকে বাঁচানো দরকার। আর সেটা সম্ভব হবে, যদি সে নিজের সবকিছু ভগবানের খাতায় জমা দেয়। "হে ভগবান, আমার যা কিছু আছে সবই তোমার সম্পত্তি—এই বাড়ী, পরিবার, ছেলেমেয়ে, সবকিছুই। আমি নিজেও তোমার পরিবারের ভৃত্য আর আমি সকলেরই সেবা করবো। তোমার প্রসাদ পেয়েই আমি বাঁচবো আমার সব প্রয়োজন মিটে যাবে। এইভাবে যাঁরা তাঁদের

পারিবারিক জীবন ভগবানকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলেন, তাঁদের পরিবারের সকলের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

জীবনের তিনটি স্তর

এইভাবে আমরা সাধারণতঃ জীবনের তিনটি স্তরের কথা ভাবতে পারি—(১) শোষণের স্তর (২) ত্যাগের স্তর (৩) আত্মনিবেদনের স্তর। যে জীবাত্মা শরণাগত হয়েছেন—যিনি নিজেকে ও নিজের সবকিছুকে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করেছেন—তিনি কোন দোষ করতে পারেন না। তিনি যাই করেন সবই ভগবানের খাতায় জমা হয়। শ্রীগীতায় ভগবান নিজে বলেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

(গীতা ৯/২৫)

"অন্যদেব পূজকগণ সেই সেই দেবতাকে লাভ করেন, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণগণ পিতৃলোক গমন করেন, ভূতপূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন এবং আমার পূজকগণ আমাকেই লাভ করেন।"

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥

(গীতা ১৪/১৮)

"সত্ত্বগুণযুক্ত জনগণ ঊর্দ্ধে (সত্যলোক) পর্য্যন্ত) গমন করেন, রজোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে (মনুষ্যলোকে) অবস্থান করে এবং ঘৃণ্য তামস প্রকৃতি ব্যক্তিগণ (নরকাদি) নিম্নতর লোকে গমন করে।"

সুতরাং যাঁরা এইসব গুণের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, তাঁরা তার যথোপযুক্ত ফল পান। কিন্তু শ্রীভগবান বলেছেন, "মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্" — "আমার পরমধাম যাঁরা প্রাপ্ত হন তাঁরা নির্গুণ, চিন্ময় স্তরে থাকেন। এইসব পার্থিব গুণের দ্বারা আবদ্ধ থাকেন না। আমার এই চিন্ময় স্তরে যে যা করেন সবই আমার প্রতি অনন্য ভক্তিতে করেন। আর সেই ভক্তিই হল সকল কল্যাণ ও আশীর্ব্বাদের উৎস।" এইভাবে শাস্ত্রতে ভক্তিকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। আপনাদের কিছু করার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, তবুও নিজেকে নিবেদন করুন, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হোন। আপনি গৃহস্থ না সন্ন্যাসী না ব্রহ্মচারী, সেটা কোন কথা নয়, আপনি যাই হন না কেন, এতেই আপনার পরম মঙ্গল হবে। আমাদের বৈদিক ধর্ম্ম এই নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

প্রেমভক্তি সকলের নিজস্ব সম্পদ

আজ আপনারা সকলে এখানে সমবেত হয়েছেন ভগবানের কথা শোনার জন্য। আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা

করলাম তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার। এর জন্যে আপনারা আমাকে যথেষ্ট সময়ও দিলেন। আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি কারণ আপনারা সকলে ধৈর্যধরে এই হরিকথা শুনলেন। আমি আপনাদের কল্যাণের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম। জগতে কতরকমের ধর্ম্ম আছে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম আপনাদের হৃদয়েই আছে। সেই হল আপনাদের নিজস্ব ক্ষমতা, নিজস্ব সম্পদ—আর তা হল শ্রীভগবানের প্রতি ভালবাসা, প্রেমভক্তি। এই বস্তু সকলের হৃদয়েই আছে, আর সকলের জন্যই তা আছে। শ্রীভগবান তাঁর হারানো সেবকদের প্রেমের সঙ্গে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আর যেমন তিনি আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তেমনি আপনাদের মধ্যেও তাঁকে খোঁজার একটি স্বতঃস্ফুর্ত্ত প্রবৃত্তি আছে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম বড় উদার

আমরা যে স্তরে আছি সেখান থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে। ছোট শিশু যখন হাঁটার চেষ্টা করে তখন প্রথমে সে কেবল পড়ে যেতে থাকে। কিন্তু যে মাটিতে সে পড়ে সেই মাটি ধরেই আবার সে দাঁড়ায়, তখন তার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। এমনি করে বারবার চেষ্টা করে শেষপর্য্যন্ত সে ঠিকই হাঁটে। তারপর সেই শিশু যখন বড় হয় তখন হয়ত সে চার মিনিটে একমাইল দৌড়তেও পারে। এতখানি তার ক্ষমতা

হতে পারে। তেমনি আমরা এই জড়জগতে বাস করে, এখানে যতটা সাহায্য পাওয়া যায় তা নিয়েই ভক্তির পথে আমাদের পরম গন্তব্যস্থলে যাত্রা শুরু করতে পারি। তখনই আমাদের পরম মঙ্গল হবে। পরের কল্যাণ চাওয়ার প্রবৃত্তিকে আমাদের হৃদয়ে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। তাহলে শুধু যে আমাদের মঙ্গল হবে তাই নয়, সমস্ত জগতের কল্যাণ সাধনে আমরা সক্ষম হবো। "বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে।" আমরা সেবার মধ্যে দিয়ে এমন একটা জীবন যাপন করতে চাইবো, যেখানে পরকে শোষণ না করেই আমাদের পারিবারিক জীবনযাত্রা চলতে পারে আর তখন আমরা দেখবো যে, কোন ভার আমাদের বহন করতে হবে না।

আমরা যদি কারোর জন্মের জন্য দায়ী না হই তাহলে আমাদেরও আর জন্ম হবে না। অনেক ব্রহ্মচারীরা এই চিন্তা করে বিবাহিত জীবন বর্জ্জন করে স্বাধীনভাবে থাকেন। কিন্তু যাঁরা বিবাহ করেন, তাঁদেরও পারমার্থিক জীবন আছে। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রমতে তাঁদের স্থান সর্ব্বোচ্চ, ধর্ম্মের জগতে; কারণ অন্য সব আশ্রমকে তাঁরা পালন করে থাকেন। তাই আপনি এখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, আপনার কৃষ্ণলোকে যাত্রার পথ আপনি এখান থেকেই শুরু করতে পারেন। সুখের জন্যে অনুসন্ধান আর দুঃখের নিবৃত্তির চেষ্টায় তো আপনারা ইতিমধ্যেই আছেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী সুখ ও দুঃখ

আপনাআপনিই আসবে ও যাবে। শ্রীভগবান বলেছেন :

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

(গীতা ২/১৪)

"হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে বিষয়ের সংযোগই শীতগ্রীষ্ম, সুখদুঃখ দান করে থাকে। কিন্তু তারা গমনাগমনশীল, অনিত্য। অতএব হে ভারত! তা সহ্য কর।"

কখনও জীবনে আনন্দ আসে, কিন্তু তারপরেই দুঃখ আসে। সূর্য্য ওঠার কিছুকাল পরে সূর্য্য অস্ত যায়, আবার ওঠে আবার অস্ত যায়। ঠিক তেমনি সুখ আসে জীবনে, তারপর দুঃখ তারপর আবার সুখ। এই পৃথিবীতে সুখের কোন ঘাটতি নেই এবং তার যখন আসার সে নিজে নিজেই আসবে। কিন্তু এই মানবজন্ম যখন পেয়েছি আর শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনেছি, যখন শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ থেকে তাঁর পরমধামের কথা জেনেছি তখন আমাদের নিজেদের সত্যিকারের ঘর, আত্মার প্রকৃতি বাসভূমি খুঁজে নেওয়ার প্রেরণা আমরা অবশ্যই পাব। শুধু সেই চিন্ময় জগতের দিকে যাত্রা শুরু করলেই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ আমরা খুঁজে পাব।

আমরা সকলেই জানি যে, কেউই আমরা এই পৃথিবীতে থাকব না। সকলকেই একদিন যেতে হবে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের সত্যিকারের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুলতা কামনা করি, তবে তার অনেক সুযোগ

আমরা পাব। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই আমরা পাব। শ্রীভগবান বলেছেন কারোর যদি এ জীবনের ভজনক্রিয়া সম্পন্ন করার আগেই মৃত্যু হয় তবে পরের জন্মে তিনি উচ্চ অধিকার পাবেন—"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে" (গীতা ৬/৪১) একবার যিনি শুভসঙ্কল্প করেন আর কখনও তিনি অশুভশক্তির দ্বারা ক্লিষ্ট হন না—"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" (গীতা ৬/৪০)। তিনি উত্তরোত্তর উচ্চতর অধিকার পান।

সাধুগণপ্রিয় শ্রীগীতা

যে জ্ঞান গীতায় দেওয়া হয়েছে তা কি সুন্দর! প্রত্যেকের যা জানা দরকার, তা সেখানে পাওয়া যাবে। সেইজন্যই সারা পৃথিবীতে গীতার প্রচার আছে। পরমভাগবত সাধুরা বলেছেন আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশের মানদণ্ড গীতায় দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ ভগবদগীতাকে যথোপযুক্তভাবে শ্রদ্ধা করেন তবে একটা মহৎ গন্তব্যের জন্য তাঁর একটা বাসনা হবে। তাঁর একটা অধিকার হবে, যেমন কলেজে ঢোকার আগে স্কুলের পরীক্ষায় পাস করতে হয়। তাই গীতায় প্রত্যেকের প্রাথমিক কল্যাণের নির্দ্দেশ দেওয়া আছে।

হরের্নামৈব কেবলম্

আজকে এই সময়টুকু দেওয়ার জন্যে আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সকলের ইচ্ছায়, আপনাদের সকলের কৃপায় আমি আজ এখানে এসেছি, তাই আমার নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য আপনাদের কিছু প্রতিদান দেওয়ার। আপনারা দয়া করে সকলে একসঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে যান আর তার থেকেই সমস্ত পারমার্থিক জ্ঞান আপনাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই এখনকার যুগধর্ম্ম। আপনারা যদি আনন্দের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন চালিয়ে যান, তবে শ্রীভগবান যিনি আপনাদের হৃদয়েই আছেন তিনি কৃপা করে নিজেকে আপনাদের কাছে প্রকাশিত করবেন, কারণ শ্রীভগবান ও তাঁর শ্রীনাম অভিন্ন।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

"'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নেই।"

তাই আজ শ্রীভগবানের কৃপায় আমরা সেই নাম সঙ্কীর্ত্তনের সুযোগ পেয়েছি এবং এখন আজকের এই সভার শুভ উপসংহারে আমরা তাই করব।

তৃতীয় অধ্যায়

সেবাময় জীবন

আমরা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী নই। আসলে আমরা সাধারণ গৃহস্থের চেয়েও বেশী গৃহস্থ; কিন্তু আমাদের গৃহ হল শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরের গৃহ। আর আমরা তাঁদেরই গৃহে, তাঁদেরই পরিবার-পরিজন হয়ে বাস করি, তাই আমরা ঠিক সন্ন্যাসী নই। যেহেতু শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরের সেবাইতের দলে আমরা আছি, তাই আমাদের মাথায় অনেক দায়িত্ব আছে। আমাদের সর্ব্বোচ্চ দায়িত্ব হল সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করা। শাস্ত্রে বলা হয়েছে প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য হল বৈষ্ণব-সেবা, গুরু-সেবা এবং এইভাবে ক্রমশঃ গৃহস্থের ভজনজীবন, সেবার জীবন পরিপুষ্ট হয়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সেবাও হল গৃহস্থের সেবার মতই। কত ভক্তরা এখানে আসা যাওয়া করছেন এবং প্রচারের উদ্দেশ্যে আমরাও কত অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি, কিন্তু এও তো একরকমের গৃহস্থ জীবন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেখানে তিনি এই শ্লোকটি দিয়েছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

(পূর্ব্ব ২/২)

অর্থাৎ, "অনাসক্ত হয়ে নিজ সাধনভক্তির অনুকূলমাত্র বিষয় স্বীকারকারীর বিষয়-বিরক্তিকে যুক্তবৈরাগ্য বলে । তাতে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় আগ্রহ থাকে । অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে বিরক্ত অথচ কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়ে আগ্রহশীল যে ব্যক্তি অনাসক্তভাবে নিজভক্তির অনুকূলমাত্র বিষয় গ্রহণ করেন, ভক্তিপ্রতিকূল বিষয় গ্রহণ করেন না, তাঁর বৈরাগ্যকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলে ।"

শুদ্ধ জীবের পরিচয় ও জীবনের লক্ষ্য

আমরা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ, তথা শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং সেই পন্থার আমাদের শ্রীল গুরুমহারাজকে অনুসরণ করছি । তাই আমরা "যুক্তবৈরাগ্যে"র তত্ত্বের ভিত্তিতেই আমাদের ভজনজীবন, সেবার জীবন যাপন করার চেষ্টা করছি । যা কিছু ভক্তির অনুকূল তাকে আমাদের জীবনে আমন্ত্রন করে আনতে হবে আর যা কিছু ভক্তির প্রতিকূল তাকে আমাদের বর্জ্জন

করতে হবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন আমরা ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্রও নই। সেইরকম আমরা বানপ্রস্থ, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীও নই। আমাদের একমাত্র পরিচয় হল এই যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের দাসের দাসের দাসের দাসানুদাস। কোন কৃষ্ণের দাস আমরা? তার উত্তর হল এই যে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ নয়, দ্বারকার কৃষ্ণ নয়, কিন্তু সেই কৃষ্ণ যিনি গোচারণ করেন, যিনি গোপীজনবল্লভ, যিনি বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে লীলা করছেন সেই কৃষ্ণ, সেই গোপকিশোর কৃষ্ণ—আমরা তাঁরই দাসের দাসের দাসানুদাস। সেইরকম দাসত্বই আমাদের সম্প্রদায়ের আদর্শ আর তাই হল আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩/৮০)

অর্থাৎ, "আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, অথবা ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। কিন্তু উন্মীলিত (অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান) নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্ররূপ গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস দাসানুদাস বলে পরিচয় দিই।"

শুদ্ধভক্তিভাবে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য-প্রাপ্তি

স্বতঃস্ফুর্ত্তভাবে এবং হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে পরিপূর্ণ প্রেমভক্তিসহকারে আমাদের জীবনে এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ও তাকে লালন করতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টাই আমাদের ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। কিন্তু গুরু, বৈষ্ণব ও মহাপ্রভু রূপেই শ্রীভগবান আমাদের সবচেয়ে নিকটে আছেন। এই গুরু-গৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণবের পাদপদ্মেই আমাদের সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে। শুধু আত্মসমর্পণ করে দণ্ডবৎ করলেই হবে না, আত্মসমর্পণ করে সেবা করতে হবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই যেন আমরা আত্মনিবেদিত সেবায় কাটাই। তাহলেই এ জগতে অন্য কিছুর জন্যে চিন্তা না করে আমরা খুব সহজেই আমাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারব। ভক্তিপ্রসূত যে ভাব তা হল এইরকম।

শ্রীলগুরুমহারাজের সিদ্ধান্তের একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত

যখন নবদ্বীপে এই মঠে, শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ" গ্রন্থটি সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হচ্ছিল তখন বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এখানে আসতেন। একদিন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মিলে একটি

কঠিন শ্লোকের অর্থ নিয়ে আলোচনা করেও সেই শ্লোকের যথার্থ অর্থ বুঝতে পারছিলেন না। সেই শ্লোকটি হল :

প্রলম্বরিপুরীশ্বরো ভবতু কা কৃতিস্তেন মে
কুমার-মকরধ্বজাদপি নকিঞ্চিদাপ্তে ফলম্।
কিমন্যদহমুদ্ধতঃ প্রভুকৃপা-কটাক্ষশ্রিয়া
প্রিয়া-পরিষদগ্রিমাং ন গণয়ামি ভামামপি ॥

(পশ্চিম ২/৫৪)

অর্থাৎ, "প্রলম্বরিপু বলদেব ঈশ্বর হোন, তাতে আমার কি, কুমার প্রদ্যুম্ন থেকেই বা আমার কি ফল? শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কটাক্ষরূপ সম্পদ প্রাপ্তিতে আমি এমন উদ্ধত যে কৃষ্ণের প্রিয়াগণাগ্রগণ্য সত্যভামাকেও আমি গ্রাহ্য করি না।"

কিন্তু এই শ্লোকের অর্থ বুঝে ওঠা খুব কঠিন, কারণ বলদেব হলেন গুরু, আর সত্যভামা হলেন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা সেবিকা, তবে কি করে কোন ভক্ত বলতে পারেন যে এঁদের তিনি গ্রাহ্য করেন না? শ্রীল রূপ গোস্বামী এরকম শ্লোক কেন রচনা করলেন?

এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁরা সবাই মিলে শ্রীল গুরুমহারাজের কাছে এলেন এবং তাঁর ব্যাখ্যা শুনেই সকলে সন্তুষ্ট হলেন। শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁদের বললেন শ্রীল রূপ গোস্বামী একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই শ্লোকটি রচনা করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভক্তের জীবনের লক্ষ্য কি সেইটা দেখানো। "হে বলদেব! হে সত্যভামা!

আপনারা দুজনেই আমার পরম পূজনীয়, কিন্তু আমার সেবায় আপনারা এখন বাধা দেবেন না। আমি আমার সেবা নিয়ে পড়ে আছি, অন্য কোন দিকে মন দেওয়ার সময় আমার নেই। আমি জানি আপনারা দুজনেই কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সেবক ও সেবিকা। কিন্তু আমিও আপনাদের দাসানুদাস। আমারও নিজের কর্ত্তব্য, নিজের সেবা অধিকার আছে।" যদি প্রভুর আসন পরিস্কার করার প্রয়োজন থাকে তবে কি প্রভু নিজেই তা করবেন? না! প্রভু যদি নিজের আসন নিজেই পরিস্কার করতে যান তাহলে ভক্ত নিশ্চয়ই আপত্তি জানাবেন। "না, না এ কাজটা আপনি করবেন না, কৃপা করে আমাকে এই সুযোগটা দিন। এই কর্ত্তব্যটা আমার, আপনার নয়।" এইভাবে ভক্তের একটা অভিমান বা অহঙ্কার আছে যে তাঁর প্রভুর সেবাটা তাঁরই প্রাপ্য। কৃপা করে আমার সেবায় বাধা দেবেন না, আপনি দয়া করে আপনার আসনে বসুন আর আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা করি।" এইরকম একটা সেবার তত্ত্বই এই শ্লোকের মধ্যে রয়েছে।

ভক্তের ঔদ্ধত্য

সেই সভায় অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা ছিলেন। শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ, যিনি প্রভুপাদ শ্রীল

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের খুব বড় ভক্ত ছিলেন এবং বিরাট সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন, তিনিও সেখানে ছিলেন। কিন্তু এর পূর্ব্বে এঁরা কেউই ওই শ্লোকের মর্ম্মার্থ বুঝতে পারেননি, কিন্তু শ্রীল গুরুমহারাজের ব্যাখ্যা শুনে সকলেই সুখী হলেন। এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা শ্রীল গুরুমহারাজ দিয়েছেন তাই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাঁর টীকায় এখন রয়েছে। "শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবাতেই ভক্তের অধিকার। সুতরাং শ্রীবলদেব বা শ্রীপ্রদ্যুম্ন বা শ্রীসত্যভামাদেবী এঁরা নিজ নিজ অধিকারে থাকবেন ও ভক্তকে কৃপা করবেন কিন্তু ভক্তকে তাঁর অধিকার ভ্রষ্ট করবেন কেন, এই হল ভক্তের ঔদ্ধত্য।" (ভঃ রঃ সিঃ পশ্চিম বিভাগ, ২য় লহরী, ৫০ পৃষ্ঠা)।

ভক্তের বা সেবকের প্রকৃতিই হল এরকম যে সে তার প্রভুকে কোন কষ্ট দিতে চায় না। যখন তার প্রভু বিশ্রাম করছেন বা ঘুমোচ্ছেন, তখনও সে তার সেবা থামাতে চায় না। তার প্রভুর সেবা সে চালিয়েই যাবে। কোন কিছুই তাকে তার প্রভুর সেবা থেকে সরাতে পারবে না: ঠিক যেমন সৈনিক পিঁপড়ে—সে যেটাকে আঁকড়ে ধরবে সেটা কিছুতেই ছাড়বে না, যদি তার মাথাটা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়, তবুও নয়।

ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সেবাদর্শ

তবে একথাও সত্যি যে একজন সেবকের পক্ষে একা সবকিছু করে ওঠা সম্ভব নয়। তাই বৃন্দাবনে এবং সর্ব্বত্রই সেবক-সেবিকার বহু দল আছে। প্রত্যেক দলেই একজন প্রধান নায়ক-নায়িকা থাকবে এবং আরও কয়েকজন প্রধান সেবক-সেবিকা থাকবেন যাঁরা অন্য সবাইকে সাহায্য করবেন ও পথ দেখাবেন। এঁরা যেমন অন্যদের উপদেশ ও নির্দ্দেশ দেন তেমনি নিজেরাও সর্ব্বক্ষণ সেবায় নিয়োজিত থাকেন।

এইভাবেই চিন্ময় সেবাজগতে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হচ্ছে আর সকলেই সেখানে খুব আনন্দে আছেন—সেই নিত্য আনন্দময় সেবাময় চিন্ময় জগতের নাম হল গোলোক বৃন্দাবন।

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্ ।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥

(শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫/৫৬)

অর্থাৎ, "যে স্থানে পরম লক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীব্রজসুন্দরীগণই কান্তাবর্গ, পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই সকলের সমস্ত বস্তুপ্রদানসমর্থ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী অর্থাৎ চিন্ময় মণিবিশেষ, তেজোময়ী ও বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী, জলমাত্রই অমৃত, কথা-মাত্রই গান, গমন মাত্রই নৃত্য, বংশী প্রিয়সখীর ন্যায় প্রিয়কার্য্যসাধিকা, জ্যোতিঃ চিদানন্দময় অর্থাৎ চিদানন্দরূপ বস্তুই জ্যোতিঃ অর্থাৎ চন্দ্রস্ূর্য্যাদিস্বরূপ সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক এবং সেই সেই প্রকাশ্য বস্তুও সেই চিদানন্দই, পরম চিৎপদার্থমাত্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য, যে স্থলে কোটি কোটি সুরভী থেকে চিন্ময় মহাক্ষীরসমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হচ্ছে, যেখানে ভূত ও ভবিষ্যদ্রূপ খণ্ডত্বরহিত চিন্ময়কাল—নিত্য-বর্ত্তমান, সুতরাং নিমেষার্দ্ধও ভূতধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপরূপ পরমপীঠকে আমি ভজন করি। সেই ধামকে এই জড়জগতে অতি স্বল্পসংখ্যক সাধুব্যক্তিই গোলোক বলে জানেন।"

পূর্ণতত্ত্বকৃষ্ণদাতা স-পার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর

এদুটি হল শ্রীব্রহ্মসংহিতার অপূর্ব্ব সুন্দর শ্লোক। একবার যদি কেউ ব্রহ্মসংহিতা পড়েন তবে তিনি তা আর ভুলতে পারবেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য

থেকে দুটি গ্রন্থ এনেছিলেন। যখন তিনি 'ব্রহ্মসংহিতা' খুঁজে পেলেন তখন তিনি মনে করলেন "এই তত্ত্বই তো আমি দিতে চাইছি।" তখন তিনি আর একটি প্রতিলিপি সঙ্গে নিয়ে নিলেন। আর একটি গ্রন্থ যা তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে নিয়ে এসেছিলেন তা হল শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় সমস্ত ভক্তিসিদ্ধান্তের সারাংশ দেওয়া হয়েছে আর 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' সমস্ত ভক্তিরসের সারাংশ রয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু একহাতে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত আর একহাতে শ্রীব্রহ্মসংহিতা নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু শ্রীব্রহ্মসংহিতা সকলের পক্ষে বুঝে ওঠা একটু কঠিন। তাই আমাদের সাহায্য করার জন্যে গোস্বামীগণ—শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল জীব গোস্বামী ও অন্যান্য আচার্য্যগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন আমাদের সম্প্রদায়ের জন্যে। সেই রকম একটি গ্রন্থ হল 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তি-রস-তত্ত্বের ব্যাখ্য করেছেন তাঁর 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে। 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত' হল শ্রীল সনাতন গোস্বামীর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। সেইরকম শ্রীল রূপ গোস্বামী রচনা করেছেন 'শ্রীলঘুভাগবতামৃত' ও আরও নানা নাটক—যেমন 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' 'শ্রীবিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব' ইত্যাদি।

অনুকরণ নয় অনুসরণ চাই

এইরকমের বহু গ্রন্থই আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও উপলব্ধির ক্রমবিকাশের জন্য রচিত হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সবরকমের গ্রন্থ পড়ার যোগ্যতা আমাদের হয়নি। অনেক গ্রন্থ আছে বা পড়ার জন্যে কোন পূর্ব্বেকার যোগ্যতা, কোন প্রাথমিক যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে যদি আমরা জড়বিষয়াসক্ত মন নিয়ে এসব গ্রন্থ পড়তে যাই তাহলে আমাদের অধঃপতন হবে, কারণ আমাদের মধ্যে তখন প্রাকৃত-সহজিয়া ভাব বা অনুকরণের প্রবৃত্তি এসে যাবে। তাই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ আমাদের মধুর রসের বিবরণ সম্পর্কিত গ্রন্থ পড়তে নিষেধ করেছেন। শ্রীল গুরুমহারাজও আমাদের ঐসব গ্রন্থ না পড়ার উপদেশ নিয়েছেন। বরং প্রথমে যদি আমরা বৈষ্ণবের আনুগত্যে থেকে প্রাথমিক গ্রন্থ পড়ার চেষ্টা করি তাই আমাদের ভজনজীবনের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হবে। আমাদের সাহায্য করার জন্যে অনেক গ্রন্থই আছে, কিন্তু তার মধ্যে শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমাদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভগবদ্গীতা ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের ভগবদ্গীতার ভাষ্য থেকে আমাদের কোন সাহায্য আসবে না পরন্তু বিপদ হতে পারে, এমনকি মায়াবাদের বিবর্ত্তগর্ত্তে পড়ে যেতে পারি।

গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদে ভজনের সাফল্য

আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য কি সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকতে হবে—এবং তা হল গুরু ও বৈষ্ণবের সেবা। এটাই সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস আমাদের জীবনে। নিজের জন্য একটা 'পজিশন' বা 'চেয়ার' বা আসন তৈরী করা খুবই সহজ জিনিস। যে কোন লোক যে কোন জায়গায় নিজের জন্যে একটা আসন তৈরী করতে পারেন। কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ পাওয়া খুব কঠিন জিনিস, যদিও সেটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং আমাদের ভজনজীবনের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস। আমাদের জীবনের একমাত্র আশা ভরসা হল যে আমাদের গুরুদেব, তাঁর গুরুভ্রাতারা এবং অন্যান্য বৈষ্ণবরা আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না। তাঁরা সবসময় আমাদের তাঁদের অহৈতুকী কৃপা দিচ্ছেন এবং সেই কৃপার সাহায্যেই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে আমরা ধরে রাখতে পারি বা পারছি।

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য,যে না ছাড়ে নিজ-জন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য-স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি' আনে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/৪৬-৪৭)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে আমরা মায়াবদ্ধ জীব এবং সেজন্যে কোন না কোন সময় আমরা নিশ্চয়ই ভুল করব। এরকম একটা সম্ভাবনা আমাদের জীবনে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমাদের গুরুদেব সে সম্বন্ধে সচেতন এবং তিনি কখনই আমাদের ছেড়ে দেবেন না। তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাখবেন এবং দরকার হলে জোর করে আমাদের উদ্ধার করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিয়ে আসবেন। এও হল গুরুদেবের একটি বিশেষ গুণ। আমাদের গুরুদেব খুব মহান, তিনি কৃপাসিন্ধু, তাই চারিদিকে থেকেই তাঁর সাহায্য আসতে পারে আমাদের মনকে উদ্ধার করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিয়ে গিয়ে তাঁর সেবায় নিয়োজিত করার জন্যে। আমার নিজের এরকম অভিজ্ঞতাও হয়েছে যে হয়ত আমাকে কখনও চেষ্টা করতে হয় এমন কিছু করার জন্যে, যে বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু জানি না, কিন্তু সেরকম চেষ্টা করার মধ্যে কোন দোষ নেই। বরং আমি জানি যে চেষ্টা আমাকে করতেই হবে, তবে চেষ্টার ফলটা রয়েছে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের হাতে। ফলের প্রতি যেন আমার স্পৃহা না থাকে, সেদিকে যেন আমার মনোযোগ না যায়। সে দিকটা তাঁরাই দেখবেন।

জীবনের সার কথা

আমি যেন শুধু সেবা করি। সেবা করার চেষ্টা আমাকে করে যেতেই হবে আর নিজের কর্ত্তব্য যেন আমি কখনও না ভুলি। এই হল আমাদের জীবনের সার কথা, আমাদের আদর্শ। বহু জন্ম আমাদের হয়েছে, লক্ষকোটি জন্ম। কিন্তু এখন কোন ভাগ্য বলে আমরা এই মানবজন্ম পেয়েছি। তাই এর সদ্ব্যবহার করার জন্যে আমাদের সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। এই জড় মানবদেহে আমাদের এক বিরাট সম্ভাবনা, এক পরম সম্ভাবনা রয়েছে।

বিরল কৃষ্ণপ্রেমের বীজ

কোন সুকৃতির ফলে, কোন সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের কৃষ্ণপ্রেমের বীজ লাভ হয়েছে যার থেকে আমাদের 'ভক্তিলতা' বেড়ে উঠতে পারে। আর সেই ভক্তিলতাকে যদি আমরা যত্নসহকারে লালনপালন করতে পারি তাহলে এই মায়ার জগত থেকে আমরা বেরিয়ে যেতে পারব। শুধু যে মায়ার জগত থেকে বেরিয়ে 'বিরজা' ও 'ব্রহ্মলোক' অতিক্রম করে পরব্যোমে পৌঁছতে পারি তাই নয়, ভক্তি লতা অবলম্বন আমরা অনায়াসেই সেখান থেকেও আরও ওপরে যেতে পারি। সেই 'ভক্তিলতা'র সাহায্যে, তাকে ধরে

ধরে আমরা আমাদের পরম গন্তব্যস্থল গোলোক বৃন্দাবনে পৌঁছতে পারি। সেখানে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই আছে আমাদের কল্পবৃক্ষ, যা আমাদের বাঞ্ছিত প্রেমফল দান করবে। তার থেকেই সর্ব্বসিদ্ধি হবে আর তাই আমাদের প্রয়োজন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জল ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৫১-১৫৫)

আমাদের পরম প্রয়োজন

এখন আমরা এই মানবদেহ পেয়েছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের কি হবে তা আমরা কেউ জানি না। আমরা জানি না মৃত্যুর পরে আমাদের কর্ম্ম আমাদের আবার কোথায় নিয়ে যাবে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

(গীতা ৮/৬)

"হে কুন্তীপুত্র! মরণকালে যে ব্যক্তি যে যে বিষয় চিন্তা করতে করতে কলেবর ত্যাগ করেন, সর্ব্বদা সেই ভাবনায় তন্ময়চিত্ত হেতু তিনি সেই সেই বিষয়কেই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।"

সুতরাং আমি যদি মৃত্যুকালে একটা কুকুরের কথা মনে করি তবে আমাকে কুকুরের গর্ভে জন্ম নিতে হবে। এইরকম বিপদের সম্ভাবনা আমাদের আছে।

সুতরাং শ্রীল গুরুমহারাজের সেবার জন্যে আমাদের সর্ব্বরকমের চেষ্টা করতে হবে, তাহলে কোনকিছুই আমাদের উদ্বেগ দিতে পারবে না, আমাদের পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আমাদের মন যেন সেই চিন্ময় জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে রাখে—সেইটি হল আমাদের পরম প্রয়োজন। আর তা যদি আমরা পারি তাহলে সবকিছুই আমরা শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে পারবো। এই হল পারমহংস্যধর্ম্ম।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীজগন্নাথধাম যাত্রার পথে

আপনারা একটা বিশেষ তীর্থস্থানে যাচ্ছেন। সেখানে আপনারা দেখবেন যে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সেবাইতদের বা পাণ্ডাদের ওখানে একটা বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। ইংরিজিতে একটা কথা আছে "তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার কুকুরকেও ভালবাসবে ('লাভ মি, লাভ মাই ডগ')" অর্থাৎ "আমাকে যদি তুমি সত্যিই ভালবাস, তবে সেই ভালবাসাটা তুমি আমার কুকুরকেও দেখাবে। যদি আমার কুকুরকেও তুমি ভালবাস তাহলে বুঝব তুমি আমাকে সত্যিকারের ভালবাস।" সেইরকম আমাদের বুঝতে হবে যে পাণ্ডারা যাই করুক না, তারা হল ওখানকার মালিক। আর জগন্নাথ তাদের সে অধিকার দিয়েছেন। আমাদের সেখানে কিছু করার নেই।

জগন্নাথ-প্রসাদের বিলক্ষণ গুণ

সারা পৃথিবীতে মহাপ্রসাদ আছে, কিন্তু জগন্নাথ ক্ষেত্রের মহাপ্রসাদ আলাদা। সেখানে পাণ্ডারা কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেয়

না এবং ম্লেচ্ছদের তারা মোটেই ঢুকেতে দেয় না। কিন্তু সেই মহাপ্রসাদই যখন বাইরে এলো তখন ওরা কিন্তু সেটা মেথরের হাত থেকেও খায়, ম্লেচ্ছের হাত থেকেও খায়। তাহলে বোঝা গেল ওদের কতকগুলি বিশেষ কাস্টম বা নীতি আছে।

ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথ

সেইসব নীতি ভাঙ্গতে গিয়েছিলেন রামানুজাচার্য্য। তার ফলে কি হল? রামানুজাচার্য্য ওখানে বৈধী মার্গে জগন্নাথদেবের পূজাটা যাতে বেশ ভাল করে হয় তার চেষ্টা করেছিলেন। কতকগুলো বিধি আমাদের শাস্ত্রে—বেদে, মনুসংহিতায় আছে, সেই অনুসারে তিনি ওখানে পূজার ব্যবস্থাটা করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করলেন যে এই পাণ্ডারা যেভাবে পূজা করছে সেটা ঠিক নয় এবং এইসব মন্ত্রতন্ত্রও ঠিক নয়, এসব ঠিকভাবে করা দরকার, বৈদিকভাবে। তাঁর সিদ্ধন্তের কাছে পণ্ডিতেরাও হেরে গেলেন। পরের দিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং সেইদিন রাজা সেই বৈধীভক্তির প্রবর্ত্তন করতে বাধ্য হবেন। রামানুজাচার্য্য শুয়ে আছেন রাত্রে; তিনি দেখলেন কে যেন তাঁর খাটটা টেনে নিয়ে বহু দূরে ফেলে দিল। সকালে উঠে তিনি দেখলেন তিনি অন্য জায়গায় শুয়ে আছেন।

তিনি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলেন, "এ আমি কোথায় শুয়ে আছি? কি আশ্চর্য্য, একেবারে আমার খাট সহ লোপাট!"

তারপর দেখলেন যে তিনি সত্যি সত্যি তিনশ মাইল দূরে কূর্ম্মক্ষেত্রে পড়ে আছেন। তখনকার দিনে তো আর এরোপ্লেন ছিল না যে তাঁকে ওইভাবে নিয়ে চলে যাবে। ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে তাঁকে তুলে নিয়ে আসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু রামানুজাচার্য্য সত্যি সত্যিই দেখলেন যে তিনি কূর্ম্মক্ষেত্রে পড়ে আছেন। তাঁকে দলবল সহ তুলে নিয়ে পাচার করে দিলেন জগন্নাথ এবং জগন্নাথ তাঁকে বলেও দিলেন স্বপ্নে যে "এখানে আমার যেমন চলছে, এখানে আমার তেমন চলবে। এখানে তোমরা ঝামেলা করতে এস না, যাও।"

এরকম একটা জায়গায় জায়গা পাওয়াই খুব কষ্টকর। তা যাই হোক শ্রীল গুরুমহারাজের প্রভাবে আর জগন্নাথের কৃপায় আমরা এখানে একটু আশ্রয় পেয়েছিলাম এবং সেই আশ্রয়টুকু পাওয়ার পরে আরও একটু আশ্রয়ও জগন্নাথ করে দিয়েছেন। গুরুমহারাজের ইচ্ছাটা পূর্ণ হয়েছে এবং জগন্নাথদেবেরও শুভেচ্ছাটা আমাদের উপর আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কারণ তখন অনেক চেষ্টা করেও পুরী যেতে পারিনি, আর এখন জগন্নাথদেব প্রায়ই টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

জগন্নাথদেবের কৃপা যাঞা

এই তো কাল আপনাদের সঙ্গে যাব কিনা এখনও আমার কোন ঠিক নেই। এখন কেবল আমি জগন্নাথের

কাছে প্রার্থনা করছি—তিনি নিলে যেতে পারব, না নিলে যেতে পারব না। কিন্তু আপনাদের সকলকে জগন্নাথ টেনেছেন এখানে। যার জন্যে আজ আপনারা এরকম একটা আশ্রমের সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে সেই জগন্নাথ ধামে যাবার সুযোগ পেয়েছেন। দেখুন পয়সা তো লাগেই জীবনে। পয়সাকড়ি সকলকেই খরচ করতে হয়। নিজেদের দেহধারণের জন্যে, বাঁচার জন্যে, পয়সা তো খরচ হয়েই যায়। কিন্তু পয়সাটাই তো সবচেয়ে বড় জিনিস নয়। আমার পয়সা থাকলেই যে আমি যেতে পারব এরকম ক্ষমতা আমার নেই এবং এটা আমার বহুবার পরীক্ষিত। আপনারা জগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা করুন সকলে মিলে যে তিনি কৃপা করে যেন আমাদের সকলকে তাঁর ওখানে ভালয় ভালয় পৌঁছে দেন, আবার সেখানে থেকে ভালয় ভালয় ফিরিয়ে দেন, যে যেখানে ভজনজীবন যাপন করছি সে সেখানে ফিরে যাক। আজ কেবল এই একটাই আমাদের প্রার্থনা, আর তো আমাদের কিছু প্রার্থনা করার নেই।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মহিমা

আমরা তো দেশ দেখতে যাচ্ছি না, আমরা তীর্থস্থানে যাচ্ছি। আমরা পবিত্র স্থানে যাচ্ছি, যেখানে গেলে নিজের দেহ, মন, আত্মা সব পবিত্র হয়ে যায় এরকম একটা ভূমি।

সমুদ্রের ধারে যাচ্ছি। মহাপ্রভু বলে গিয়েছেন "সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইল।" এমনিই সমুদ্র মহাতীর্থ, কেননা সব তীর্থের জল এসে সমুদ্রে পড়ে। তারপর সেখানে হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ হলে তাঁর দেহ কোলে করে মহাপ্রভু নৃত্য করেছেন। নৃত্য করে মহাপ্রভু যখন তাঁর দেহ সমুদ্রেতে ধুলেন, তখন বললেন "আজ এই সমুদ্র সত্যিকারের মহাতীর্থ হল।" কেননা শ্রীমদ্ভাগবতেই আছে,

শুদ্ধভক্তগণ স্বয়ং তীর্থস্বরূপ

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥

(১/১৩/১০)

"আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। আপনারা গদাধর শ্রীকৃষ্ণকে সতত হৃদয়ে ধারণ করেন বলে পাপীগণের পাপমলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করতে সমর্থ।"

যাঁরা হৃদয়ে সবসময়ে গদাধর ভগবানকে ধারণ করে থাকেন তাঁরা সমস্ত তীর্থকে পবিত্র করবেন না তো আর কে করবেন? তাঁরাই তো "ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো"। "আপনারা নিজেরাই তো তীর্থ হয়ে গেছেন তবে তো আপনাদের আর তীর্থভ্রমণ করার দরকার নাই। তবে আপনারা তীর্থে যান কেন?" ভক্তকে বলা হচ্ছে—তাঁরা

তীর্থে যান কেননা "তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা" । সত্যিকারের পাপী লোক তারা সব গিয়ে তীর্থকে অনেক মলিন করে দেয়। কেননা সকলেরই একটা যোগ্যতা বা ক্ষমতা আছে, ধারণ করার একটা ক্ষমতা আছে। তা আমাদেরও এমন একটা ক্ষমতা আছে যে আমাদের পাপের বোঝা এত বেশী যে তীর্থও সেটা হজম করতে পারে না। তখন তীর্থও স্বভাবতঃই মলিন হয়ে যায়। আর তখনই ঐ যাঁরা গদাধর ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করে থাকেন তাঁরা সেই তীর্থে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তাঁরা একবার তীর্থের জলে ডুব দিলেই ফিটকিরির মত সমস্ত ময়লা কেটে যায় এবং জলটা আবার নির্ম্মল হয়ে যায় । এই হচ্ছে তাঁদের স্বাভাবিক ক্ষমতা এবং মহাপ্রভু সেটা চরমভাবে দেখিয়ে দিলেন সেই জিনিসটা যেটা "ভবদ্বিধা ভাগবতাঃ" এই শ্লোকে বলা হয়েছে । হরিদাস ঠাকুর নিরন্তর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করেছেন । তিনি তিনলক্ষ নাম জপ করতেন । সারা স্থাবর-জঙ্গমে উচ্চৈঃস্বরে নাম করে তিনি সকলকে পবিত্র করেছেন আর তাঁর নিজের পবিত্রতার তো কথাই নেই। সেই হরিদাসের দেহ আবার মহাপ্রভু নিজে কোলে করে নেচে সেই তীর্থস্থানে, সমুদ্রের জলে স্নান করিয়ে "প্রভু কহে,—সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা ।" এইভাবে সেই মহাতীর্থে আপনারা যাচ্ছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিসূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত

এখানে আমাদের যেসব পশ্চিমের ভক্তরা আছেন তাঁরা হয়ত জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন না। তবুও তাঁরা বারবার ওখানে যান ও থাকেন। তার একটাই কারণ যে ঐ স্থান ওঁদের আকর্ষণ করে মহাপ্রভুর লীলাভূমি বলে। মহাপ্রভু অনেক জায়গা থাকতে যে নীলাচল ধাম, কুরুক্ষেত্র থেকে অভিন্ন, সেই নীলচলধামকেই বেছে নিয়েছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছিলেন যে কুরুক্ষেত্রই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় ভজনের স্থান। কেননা কুরুক্ষেত্রে শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণের জন্যে বিরহ ব্যাকুলতা তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। যেখানে লালসা বা ব্যাকুলতা সবচেয়ে বেশী আছে, প্রেমভক্তির পক্ষে সেটাই তো সবচেয়ে বড় প্রয়োজনের জায়গা। ক্ষুধা যদি আপনাদের না থাকে তাহলে আপনাদের যদি হাজার রকমের ভালমন্দ খাবার দেওয়া যায় সেগুলো তো আপনারা অত তৃপ্তি করে খেতে পারবেন না। কিন্তু যেখানে আপনাদের প্রচণ্ড ক্ষুধা আছে সেখানে শাকান্ন বা লবনভাতও মনে হবে যেন অমৃত। ছোটবেলায় আমার ম্যালেরিয়া হয়েছিল। তখন ডাক্তার পোড়ের ভাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। আপনারা তো জানেন কি করে পোড়ের ভাত তৈরী হয়। কয়েকটা ঘুঁটে দিয়ে একটা মাটির

হাঁড়িতে বসিয়ে তাতে দুটো চাল ফেলে দেওয়া হয়। সে চাল বুদ্‌বুদ্‌ করে ফুটছে এক দেড় ঘণ্টা ধরে আর আমি সেদিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম যে কখন সে চাল সেদ্ধ হবে আর তারপর আমি খাব। তা এই যে চাহিদাটা, ভিতরের চাহিদা, সেইটা হল সবচেয়ে বড় জিনিস—তাকে বলে 'ক্ষুধা' আর রাগানুগা ভক্তি হল সেইরকম।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি পরমদুর্ল্লভ

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮/৭০)

অর্থাৎ, "কোটিজন্মকৃত সুকৃতি দিয়ে যা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটি মূল্য দিয়ে যা পাওয়া যায়, এই রকম কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি যেখান থেকেই পাও, ক্রয় করে ফেল।"

ভগবানের রসভাবিতা যে মতি, যে প্রেমভাব, মহাভাব, আনন্দচিন্ময়রস-ভাবিতা মতি, এইরকম জাতের যে জিনিস, যে ভক্তি সে ভক্তি তো সাধারণ ভক্তি নয়। সে ভক্তির চাহিদাও সেইরকমের। ভগবান নিজে বলেছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্ ।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

(ভাঃ ৯/৪/৬৮)

"সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয় । তাঁরা আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানেন না । আমিও তাঁদের ছাড়া আর কাউকে আমার বলে জানি না ।"

"আমার আর কিছু করার নেই বাবা" ভগবান বলছেন দুর্ব্বাসাকে, "যে দেখ সাধুরা তাদের হৃদয়ে আমাকে বেঁধে রেখে দিয়েছে আর আমিও সাধুদের বেঁধে রেখে দিয়েছি আমার হৃদয়ে । অতএব আমাদের এখানে দেনাপাওনা শেষ হয়ে গেছে । আমি তো নিরপেক্ষ হতে পারব না!"

পরম ভক্ত রাজা অম্বরীষের মাহাত্ম্য-বর্ণন

পুরাকালে মহারাজ অম্বরীষ নামে এক ভক্ত রাজা ছিলেন । মহারাজ অম্বরীষ বিপুল ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন । তিনি অত্যন্ত সচ্চরিত্র, পুণ্যবান, ধার্ম্মিক ও প্রজাপালক রাজা ছিলেন । কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল এই যে তিনি ভগবান শ্রীহরির একান্ত ভক্ত ছিলেন । তিনি কায়মনোবাক্যে শরণাগত হয়ে শ্রীহরির পূজা করতেন । তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, দারা-পুত্র-পরিবার-পরিজনে তাঁর কোন আসক্তি ছিল না । তিনি নববিধা ভজনে কৃষ্ণের

পূজা করতেন। সমস্ত জাগতিক কামনা বাসনা ত্যাগ করে তিনি শ্রীহরির সেবা করতেন। মহারাজ অম্বরীষের একান্ত ভক্তিতে ভগবান শ্রীহরি প্রীত হয়ে রাজাকে তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়েছিলেন রাজার রক্ষার জন্যে।

এই পরম ভক্তিমান মহারাজ অম্বরীষ একদা সংবৎসর একাদশী ব্রত পালন করার পরে দ্বাদশীতে পারণ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি একান্ত ভক্তি ও পরম যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে শ্রীহরির সেবা করার পর মহা আড়ম্বরে গো ব্রাহ্মণ ও অতিথির সেবা করলেন। তারপর যখন তিনি নিজেও একাদশীর উপবাস ভঙ্গ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন ঠিক সেইসময়ে দুর্ব্বাসা মুনি সেখানে উপস্থিত হলেন। মহারাজ অম্বরীষ প্রত্যুত্থান করে তাঁকে যথাযথ মর্য্যাদার সঙ্গে স্বাগত জানালেন। তাঁকে আসন দান করে ও নিষ্ঠা সহকারে সেবা ও অর্চ্চনা করে রাজা তাঁর পদতলে দণ্ডবৎ হয়ে বিনয়ের সঙ্গে দুর্ব্বাসা মুনিকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। দুর্ব্বাসা মুনি তাতে সানন্দে সম্মত হয়ে যমুনায় তাঁর অবশ্যকৃত্য পালন করতে চলে গেলেন। সেখানে মুনিবর বহুক্ষণ যমুনায় স্নান ও ধ্যান করলেন। ইতিমধ্যে মহারাজ অম্বরীষ দেখলেন যে পারণের সময় প্রায় অতিবাহিত হতে চলল অথচ তিনি উপবাস ভঙ্গ করতে পারছেন না কারণ তাঁর অতিথি তখনও ফেরেননি। অতিথিকে আগে না খাইয়ে ধার্ম্মিক রাজা নিজে আগে

খেতে পারেন না। এদিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পারণ করা বা উপবাস ভঙ্গ করাও তাঁর অবশ্য কর্ত্তব্য। তখন রাজা মহাসঙ্কটে পড়ে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। রাজা বললেন, "অতিথি ব্রাহ্মণের প্রতি যথাযত সম্মান প্রদর্শন না করা, ও আতিথ্য ধর্ম্ম যথাযথভাবে পালন না করা মহা দোষ। অথচ যথাসময়ে একাদশীর উপবাস ভঙ্গ না করাও অপরাধ, তাতে ব্রত ভঙ্গ হবে। তাই যদি আপনারা অনুমতি দেন তবে আমি একটুমাত্র জলপান করে এই উপবাস ভঙ্গ করব।" তারপর ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে মহারাজ অম্বরীষ সামান্য জলপান করলেন, কারণ জলপান করাকে খাওয়াও বলা যায় আবার না খাওয়াও বলা যায়।

মুনির ক্রোধ ও রাজার স্থৈর্য্য

দুর্ব্বাসা মুনি যমুনা থেকে ফিরে এলে রাজা আবার তাঁকে যথাযথ স্বাগত ও সম্মান জানালেন। কিন্তু মুনিবর তাঁর যোগবলে জানতে পারলেন যে মহারাজ অম্বরীষ তাঁর অনুমতি না নিয়েই ইতিমধ্যে জলপান করেছেন। ক্ষুধার্ত্ত মুনি এতে অত্যন্ত কুপিত হলেন। রাজা তাঁর সামনে করযোড়ে দাড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু মুনি ক্রোধে কম্পমান হয়ে ভ্রুকুটি কুটিল নয়নে রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁকে অনেক অকথ্য কটুবাক্য বললেন। তারপর তিনি রাজাকে

দণ্ড দেওয়ার জন্যে তাঁর নিজের মাথা থেকে একটা চুল ছিঁড়ে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত এক ভয়াবহ দানব সৃষ্টি করলেন। হাতে অসি নিয়ে সেই জ্বলন্ত দানব বিপুলবেগে রাজার দিকে ধাবিত হল। কিন্তু মহারাজ অম্বরীষ তাকে দেখে একটুও বিচলিত হলেন না এবং যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে থেকে এক পাও নড়লেন না।

ভক্তবৎসল ভগবানের অপূর্ব্ব অনুরাগ

কিন্তু শ্রীভগবানের ভক্তকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর সুদর্শন চক্র তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই দানবকে ভস্মীভূত করে ফেলল। যখন দুর্ব্বাসা মুনি দেখলেন যে শুধু যে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হল তাই নয়, সেই সুদর্শন চক্র এবার তাঁর পিছনেই ধাওয়া করেছে তখন প্রাণভয়ে ভীত হয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেলেন। সন্ত্রস্ত-চিত্ত দুর্ব্বাসা মুনি আশ্রয়হীন হয়ে পাগলের মত চারিদিকে ছোটাছুটি করতে লাগলেন।

দেবেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণ-সমীপে দুর্ব্বাসা মুনি

কিন্তু কোথাও আশ্রয় না পেয়ে শেষপর্য্যন্ত তিনি ব্রহ্মাজীর শরণাগত হলেন ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন "হে

প্রভু, আপনি আমাকে শ্রীভগবানের এই তেজোময় সুদর্শন চক্র থেকে রক্ষা করুন।” কিন্তু ব্রহ্মাজী তাঁকে বিষ্ণুর মহিমা স্মরণ করিয়ে বললেন যে “সমস্ত জগতই তাঁর থেকে সৃষ্ট হয়ে আবার তাঁতেই বিলীন হয়। আমি ও মহাদেব—আমরা সকলেই তাঁর শরণাগত। তাঁর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ করে, লোকহিতের জন্যে তাঁর আদেশ ও ইচ্ছা পালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য।” তখন দুর্ব্বাসা মুনি ব্রহ্মাজীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে, বিষ্ণুচক্রের তেজদ্বারা তাপিত হয়ে কৈলাসবাসী মহাদেবের শরণ নিলেন। তখন মহাদেব তাঁকে বললেন, “দেখ বাছা, ব্রহ্মাজী বা আমি বা অন্য দেবদেবী—আমরা যারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছি—আমাদের কারোরই ক্ষমতা নেই শ্রীভগবানের ক্ষমতার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার। কোটি কোটি বিশ্ব ও জীবসকল কেবল শ্রীভগবানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সৃষ্ট ও ধ্বংস হচ্ছে। আমরা সকলেই শ্রীভগবানের মায়ার দ্বারা আবৃত আছি। আর এই সুদর্শন চক্রের তেজ আমাদের কাছেও দুর্ব্বিষহ মনে হয়। তুমি শুধু শ্রীহরির শরণগত হও। তিনি দয়াপরবশ হয়ে নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল করবেন।” তখন দুর্ব্বাসা মুনি মহাদেবের কাছেও আশ্রয় না পেয়ে ছুটলেন বৈকুণ্ঠ-ধামে, যেখানে নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিরাজ করছেন। সুদর্শন চক্রের তেজে তেতেপুড়ে গিয়ে দুর্ব্বাসা মুনি সটান নারায়ণের শ্রীচরণে গিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

মুনির প্রার্থনা ও ভক্তজনপ্রিয় ভগবানের হৃদয়স্পর্শী উত্তর

তিনি কাতর হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে প্রভু, আপনি সাধুগণের ইপ্সিত, হে অচ্যুত! হে অনন্ত! আপনি সমস্ত জগতের রক্ষাকর্ত্তা । আমি বড় অপরাধী, আমি আপনার চরণে পতিত হয়েছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, রক্ষা করুন ।" তখন শ্রীহরি দুর্ব্বাসা মুনিকে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ! আমি ভক্তপরাধীন । আমি ভক্তপরতন্ত্র । পরমভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করে আছেন । আমি ভক্তজনপ্রিয় । যারা পত্নী, গৃহ, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, প্রাণ, বিত্ত সমস্ত ত্যাগ করে আমার শরণ নিয়েছে তাদের পরিত্যাগ করতে আমার উৎসাহ কেমন করে হবে? তোমাকে আমার উপদেশ হল এই যে তুমি মুহূর্ত্তমাত্র কালবিলম্ব না মহারাজ অম্বরীষের কাছে গিয়ে তার শরণাগত হও, তাঁর কাছে ক্ষমা চাও । আমার ভক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ করে তুমি নিজেরই ক্ষতি করেছ । কেউ যদি নিজের ক্ষমতা আমার ভক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে তবে সে নিজেরই অমঙ্গল ডেকে আনে ।" এইভাবে শ্রীহরি দুর্ব্বাসা মুনিকে বুঝিয়ে দিলেন যে ভগবান তিনি ভক্তের কাছে বাঁধা আছেন । তিনি নিরপেক্ষ হতে পারেন না ।

মযি নির্ব্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ং সৎপতিং যথা ॥

(ভাঃ ৯/৪/৬৬)

"সৎস্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশ করে, সেইরকম আমাতে বদ্ধহৃদয় সমদর্শী সাধুগণ আমাকে ভক্তিদ্বারা বশ করেন।"

এখানে ভগবান বলছেন যে "সৎপতিকে যেমন তার সৎস্ত্রী বশীভূত করে ফেলেন, সেবার দ্বারাতে, আমার ভক্তরা আমাকে তেমনি বশীভূত করে ফেলে সেবার দ্বারা। তাদের চাহিদাটা কি? শুধু আমার সেবা, অন্য কিছু তারা চায় না। যদি সেবা করতে গিয়ে নিজের একটু আনন্দ হয়, একটু সুখ হয় তাহলে মনে করে "এটা বুঝি আমার অপরাধ হয়ে গেল, এটা আমার ভোগ হয়ে গেল" এবং কৃষ্ণ সেটা দেখবার জন্য তাদের আবার সেবা খুব দান করেন। এতটা দান করেন যে শেষকালে তাঁরা প্রমত্ত হয়ে যান।

পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেতে গৌর-কৃষ্ণ অবতারের গুহ্য প্রয়োজন

কৃষ্ণ ভাবেন "আমার দর্শনে রাধারাণী এত সুখ পান? কিছু কতটা? তার তো কোন পরিমাণ আমার কাছে নেই! কি করে পরিমাপ থাকবে? কারণ আমি তো নিজে রাধা হতে পারি না। অতএব আমার তো পরিমাপ করার ক্ষমতা নেই।"

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১/৬)

অর্থাৎ, "শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরকম, আমার অদ্ভুত মধুরিমা, যা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তাই বা কিরকম, আমার মধুরিমার অনুভূতি থেকে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মালে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করলেন।"

ভগবান কৃষ্ণ নিজেকে আস্বাদন করার জন্য, সেই চরম আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব এবং কান্তি অঙ্গীকার করে গৌরসুন্দর রূপে জগতে আর্বিভূত হলেন। রাধারাণীর যে কতটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা কৃষ্ণসেবার জন্য সেইটা আস্বাদন করার জন্য রাধারাণীর চরম বিপ্রলম্ভ যে ভাব সেই ভাবকে অঙ্গীকার করে কুরুক্ষেত্ররূপ যে জগন্নাথধাম সেখানে উপস্থিত হলেন। কেননা সেখানে "আমার বঁধূয়া আনবাড়ী যায় আমারই আঙ্গিনা দিয়া।" সেখানে রাধারাণী কৃষ্ণকে দেখে ভাবছেন "আমার বুকের উপর মই ডলে বেরিয়ে যাচ্ছেন আমার প্রাণনাথ।" রাধারাণী জানেন যে তাঁর জীবনসর্ব্বস্ব হচ্ছেন কৃষ্ণ। অথচ সেই কুরুক্ষেত্রে তিনি দেখছেন কৃষ্ণের চারিদিকে তাঁর ছেলেপিলে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, মহিষীগণ—সব দুনিয়া সহ তাঁর চারপাশে ভীড় করছে। আর রাধারাণী হলেন গোপবালিকা সেখানে তাঁর কোন পাওাই হতে পারে না। কিন্তু তাঁরা তাঁকে সে পাওাটা দিলেন এবং এমনভাবে দিলেন যে তাঁরা তাঁকে বললেন "একবার রাসনৃত্যটা তোমাদের ওখানে কৃষ্ণ কি ভাবে করতেন আমাদের দেখাও।"

সেই রাসনৃত্য দেখে তাঁরা এত মোহিত হয়ে গেলেন যে তাঁরা বললেন যে "এই অপূর্ব্ব জিনিসের আস্বাদন তো আমরা কখনও পাইনি।" তখন রাধারাণী তা শুনে হাসলেন। হেসে বললেন, "এ আর তোমরা কি দেখলে? এখানে তো মরা জিনিস দেখলে! আসল জিনিস তো তোমরা দেখনি, সেটা হচ্ছে বৃন্দাবনে। কোথায় এখানে সেই যমুনা, কোথায় সেই কদম্বকানন, কোথায় সেই শুক-পিক, নানা পক্ষীগণের কাকলিধ্বনি, আর কোথায় সেই আমাদের হৃদয়েশ্বর কৃষ্ণ, বংশীবাদন, গোচারণ করে বেড়ান যিনি। সেসব তো এখানে কিছুই নেই, তা তোমরা এখানে রাসনৃত্য কি করে পাবে? যেটা দেখলে এটা হচ্ছে ছায়া। আসল কায়া যদি দেখতে চাও তো যাবে বৃন্দাবনে।"

ভক্তির যে চরম উৎকর্ষতা সেটা কৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবকেই বলেছেন যে "দেখ উদ্ধব তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয়।"

ন তথা মে প্রিয়ত্তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

"উদ্ধব, তুমি আমার যতটা প্রিয় স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও আমার ততটা প্রিয় নন, আত্মযোনী যে ব্রহ্মা তিনি আমার এতটা প্রিয় নন, শঙ্করও নন, এমনকি আমার দাদা যে বলদেব তিনিও এতটা প্রিয় নন, স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নই, যেরকম তুমি, আমার ভক্ত, আমার প্রিয়।" আর সেই উদ্ধব বলেছেন,

আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্ ।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥

(ভাঃ ১০/৪৭/৬১)

"অহো! আমি যেন ব্রজসুন্দরীগণের পাদপদ্মসেবী বৃন্দাবনের গুল্মলতা অথবা ঔষধির মধ্যে কোন একটিরূপে জন্মগ্রহণ করতে পারি । যেহেতু তাঁরা দুস্ত্যাজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করে শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজনা করেছেন ।"

ওঃ, গোপীগণের ভক্তি দেখে, তাঁদের প্রেম দেখে, কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ আর প্রীতি দেখে বৃন্দাবনে গিয়ে উদ্ধব এত মোহিত হয়ে গেলেন যে তিনি বলছেন যে "জন্ম-জন্মান্তরে আমি একটাই আকাঙ্ক্ষা করি । যেন এই বৃন্দাবনের ধূলি হয়ে জন্মাতে পারি । শুধু ধূলি নয়, সেই ধূলি মাখবার মত যোগ্যতা যাদের আছে, সেইসব লতাগুল্ম হয়ে যেন আমি এখানে নিত্যকাল বাস করতে পারি । স্বয়ং কৃষ্ণ এই সমস্ত পথ দিয়ে হেঁটে গেছেন, এ সব জায়গায় তিনি লীলাবিলাস করছেন, আর তাঁর সহচরীগণ, তাঁরাও এই সমস্ত জায়গায় কেবল ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন । তাঁদের পদধূলি আমার গায়ে লাগবে, এইরকম একটা ছোট লতা বা তৃণ হয়ে যদি আমি এখানে জন্মাতে পারি সেটাও আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় ।"

শ্রীল গুরুমহারাজের অলৌকিক রসাস্বাদন— শ্রীনীলাচলধামে শ্রীরাধাভাবস্বরূপ গদাধর পণ্ডিত

এইরকম যেখানে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য, আর সেইরকম তাঁর বিপ্রলম্ভ, সেই বিপ্রলম্ভের চরম সীমা হচ্ছে শ্রীনীলাচলধাম। মহাপ্রভু সেইটা আমাদের দর্শন করিয়ে দিয়েছেন। আর মহাপ্রভুকে যিনি নিভৃত হৃদয়ে রেখে চরম সেবা প্রদর্শন করেছেন সেই গদাধর পণ্ডিতও সেখানেই বাস করেছেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়ে তিনি জগন্নাথ পুরীতে ক্ষেত্রসন্ন্যাস করলেন। তাঁর ইচ্ছায় গোপীনাথ প্রকট হলেন, সেই গোপীনাথও আপনারা এখানে দেখবেন। মহাপ্রভুর অবস্থা, গদাধর পণ্ডিতের অবস্থা—এই দুটিই শ্রীল গুরুমহারাজ একটি সুন্দর শ্লোকে বর্ণনা করেছেন।

নীলাম্ভোধিতটে সদা স্ববিরহাক্ষেপান্বিতং বান্ধবং
শ্রীমদ্ভাগবতী কথা মদিরয়া সঞ্জীবয়ন্ ভাতি যঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতং সদা স্বনয়নাশ্রুপায়নৈঃ পূজয়ন্
গোস্বামিপ্রবরো গদাধরবিভুর্ভূয়াৎ মদেকাগতিঃ॥

এই গদাধর পণ্ডিত হচ্ছেন আমাদের সর্ব্বস্ব ধন। সেই নীলাচলে যেখানে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গরূপী কৃষ্ণ, যিনি তাঁর সর্ব্বস্ব হরণ করে নিয়েছেন, তাঁকে নিঃস্ব করে দিয়েছেন এবং দিয়ে সেখানে বসে বসে তাঁর বিপ্রলম্ভ বিলাপের যে সমুদ্র

প্রকাশ করেছেন, সেই সমুদ্রের তীরেই রয়েছেন গদাধর পণ্ডিত। মহাপ্রভু আক্ষেপ করছেন কৃষ্ণবিরহে। একেবারে গলে যাচ্ছেন মহাপ্রভু, এত তীব্র বিরহ। কখনও দীর্ঘদেহ হয়ে যাচ্ছেন, কখনও সঙ্কুচিত দেহ হয়ে যাচ্ছেন, কখনও কূর্ম্মকার হয়ে যাচ্ছেন, কখনও সন্ধি, শাবল্য এসে যাচ্ছে। সেইরকম নিজের আক্ষেপান্বিত কৃষ্ণ যেখানে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হয়ে তীব্রভাবে কৃষ্ণানুসন্ধান করছেন, সেইরকম কৃষ্ণকে যিনি সবসময় তাঁরই কথা শোনাতেন, "শ্রীমদ্ভাগবতী কথা মদিরয়া সঞ্জীবয়ন্ ভাতি যঃ", তিনিই হলেন আমাদের গদাধর পণ্ডিত। মানুষের যখন প্রচণ্ড শোক হয় তখন মানুষ কি করে? শোকেতে যখন সে অন্ধ হয়ে যায় আর কি করে শান্তি পাবে ঠিক করতে পারে না তখন কেউ কেউ মদ খায়। কোনরকম একটা মস্ত বড় আঘাত পেলে সেই আঘাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে কেউ কেউ মদ খায়। গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর জন্যে সেই মদের ব্যবস্থা করে ছিলেন। "শ্রীমদ্ভাগবতি কথা মদিরয়া সঞ্জীবয়ন্ ভাতি যঃ"। তিনি ভাগবত-কথারূপ মদিরার দ্বারাতে মহাপ্রভুকে সঞ্জীবিত করতে লাগলেন। যেখানে মহাপ্রভু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন, তাঁকে গদাধর পণ্ডিত আবার জীবিত করতে লাগলেন। এইভাবে নিজের প্রাণনাথকে তিনি সেখানে সেবা করছেন।

আবার গদাধর পণ্ডিতের বিরহটা আবার কিরকম? "শ্রীমদ্ভাগবতং সদা স্বনয়নাশ্রুপায়নৈঃ পূজয়ন্"। তাঁর বিরহটা

এমন যে তিনি দেখছেন তাঁর প্রভু তাঁর সামনে রয়েছেন আর এমনভাবে আক্ষেপ করছেন, একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন, ক্ষণে জ্ঞান হচ্ছে, ক্ষণে মূর্চ্ছা যাচ্ছেন, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ইত্যাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার তাঁর দেহে আসছে, অথচ তিনি তাঁর কিছু করতে পারছেন না। কেবলমাত্র ভাগবতী কথারূপ মদিরার দ্বারা তাঁকে সঞ্জীবিত করছেন আর সেই দুঃখে, সেই আক্ষেপে তাঁর নয়ন দিয়ে সর্ব্বদা অশ্রু ঝরে পড়ছে। গদাধর পণ্ডিত ভাগবত পাঠ করতে করতে কৃষ্ণবিরহে, মহাপ্রভুর বিরহে এতটা উন্মত্ত, পাগল হয়ে যেতেন যে তাঁর চোখের যে ধারা পড়ত তাতে ভাগবত ধুয়ে দিত।

তার প্রমাণ হল শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন তাঁর কাছে ভাগবত পড়তে এলেন, তখন তিনি বললেন, "বাবা, মহাপ্রভুকে ভাগবত শুনিয়ে আমার ভাগবতের অক্ষরগুলি সব মুছে গেছে। এর থেকে আর তোমাকে আমি কিছু পড়াতে পারব না। তুমি একটা পুঁথি জোগাড় করে নিয়ে এস। মহাপ্রভু আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন যে তুমি আসছ এবং তোমাকে আমি পড়াব। কিন্তু তুমি একটা পুঁথি জোগাড় করে আন। আমার নিজের সব মুখস্ত আছে, আমি সব বলতে পারি। কিন্তু তোমারও তো একটা পুঁথি দরকার।" সেইভাবে ছিল গদাধর পণ্ডিতের পূজা — "সদা স্বনয়নাশ্রুপায়নৈঃ পূজয়ন্"। পূজা করতে গেলে কি উপায়নের দরকার হয়? নয়নাশ্রু হল তার একমাত্র উপায়ন।

"গোস্বামিপ্রবরো গদাধরবিভুর্ভূয়াৎ মদেকাগতিঃ ।" সেই গদাধর প্রভুই হলেন আমাদের একমাত্র গতি । আমাদের উপাস্য দেবতা হলেন গৌর-গদাধর । আর সেই গৌর-গদাধরের চরম বিপ্রলম্ভের স্থান সেই নীলাচলধাম ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—ভক্তিরসশাস্ত্রের চরম উৎকৃষ্টতা

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এক একটা ভাগবত শ্লোকের এমন এক একটা চরম চরম অর্থ দিয়ে তার সর্ব্বগুহ্যতর-সম্পদ এমনভাবে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন যেটা আমরা কল্পনাই করতে পারি না ।

আহুশ্চ তে নলিন-নাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥

(ভাঃ ১০/৮২/৪৮)

অর্থাৎ, "হে নলিননাভ, বিদ্বজ্জন বলেন যে, অগাধবোধ যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে চিন্তনীয় এবং সংসার কূপ পতিতজনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন তোমার পাদপদ্ম গৃহসেবী আমাদের মনে সর্ব্বদা উদিত থাকুক ।"

মহাপ্রভু যখন রথযাত্রায় জগন্নাথকে দর্শন করছেন, তখন তিনি রাধাভাবে ভাবিত হয়ে জগন্নাথকে দেখে

এইভাবে প্রার্থনা করছেন যে,

আনের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
প্রাণনাথ, শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ—আমার সদন, তাহাঁ তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥ধ্রু॥
পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানে কহিলা উপায়।
তুমি—বিদগ্ধ, কৃপাময়, জানহ আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায়॥
চিত্ত কাড়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য-পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী,
শুনি' গোপীর আরো বাড়ে রোষ॥
দেহ-স্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাহাঁ তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।

বিরহ সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে নেহ’ তার পার ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩/১৩৭-১৪২)

কি তীব্র বিরহ! কৃষ্ণ, তুমি কি বলছ! “দেহ-স্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাহাঁ তার, তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।” তোমার ভজনা করে লোকে উদ্ধার পাবার জন্যে, আমাদের তো সেই ভজনা নয়। আমরা তো উদ্ধার পেতে চাই না। আমাদের নিজেদের দেহস্মৃতিই নেই, তবে আমাদের সংসারকূপ কোথায়? তুমি বলছ যে সংসার থেকে উদ্ধার লাভ করব তোমার ভজনেতে! আমরা সব আহিরিনী গোপী, আমাদের কি আছে যা দিয়ে তোমার পূজা করব? ঐ ধরনের তো ক্ষমতা আমাদের কিছু নেই। আমরা যোগ, ধ্যান, জপ, তপ এসব কিছুই জানি না। আমরা কেবল তোমার চরণারবিন্দ কামনা করি।

আহুশ্চ তে নলিন-নাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥

যারা এসব চিন্তা করে তোমাকে পাবার জন্যে, সংসার থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে, ওসব পথ তাদের জন্যে। আমাদের শুধু ঐ চরণদুটিই সম্বল। অতএব

তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥

অলৌকিক লীলাক্ষেত্র নীলাচলধামের অগাধ মহিমা

এইসমস্ত সব গভীর বিপ্রলম্ভ ভাবের প্রচণ্ডভাবে অনুশীলন হয়েছে সেই নীলাচলধামে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে—পরম আনন্দ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২/৭৭)

সেইস্থানে আপনারা যাচ্ছেন। জগন্নাথ কৃপা করে আপনাদের আকর্ষণ করেছেন। আমরা সকলে সেখানে গিয়ে ধন্যাতিধন্য হব এবং নিজেদের দৈন্য সেখানে যদি আমরা সত্যিকারের নিবেদন করতে পারি তবেই আমরা পূর্ণতা লাভ করব।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

(ঈশোপনিষৎ)

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণানুসন্ধানই জীবনের লক্ষ্য

আমরা ক্ষুদ্র হতে পারি, কিন্তু তিনি তো পূর্ণ বস্তু। পূর্ণের সঙ্গে যদি সম্পর্ক হয় তাহলে শূন্য বাদ দিলে যেমন

শূন্য থাকে, পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলেও তেমনি পূর্ণই থাকবে। অতএব আমরা সম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারি। এইরকম হৃদয়ে ভাব নিয়ে আপনারা যাবেন জগন্নাথদেবের কাছে। সুখদুঃখ সব জায়গাতেই আছে, কোথায় নেই, ঘরেও আছে, বাইরেও আছে। আপনারা সেসব কিছু পরোয়া করেন না, তা আমি নিশ্চয়ই জানি। কিন্তু তবুও সময়ে অসময়ে সুখদুঃখের অনুভূতিটা আমাদের আসে, যেহেতু আমরা দেহধারী জীব। দেহটা আছে এবং এ ব্যাটাচ্ছেলে কোন অসুবিধেই সহ্য করতে চায় না। আরাম খেয়ে খেয়ে ঘরে, আরামেই থাকতে চায় সব জায়গায়। কিন্তু আরাম হারাম হ্যায়। আসলে ঐ ধরনের আরামের তো আমাদের কোন দরকার নেই জীবনে। হাতি হয়ে কত জঙ্গল খেয়ে ফেলেছি তখন আমাদের ক্ষুধা মেটেনি। শূকর হয়ে কত বিষ্ঠার পাহাড় আমরা উজাড় করে ফেলেছি, তবুও আমাদের ক্ষুধা মেটেনি। অতএব জীবনের পর জীবন আরাম আমরা খুঁজে বেড়িয়েছি কিন্তু আরাম আমরা পাইনি। তাই সেটাকে হারাম করে যাতে আমরা যিনি "রসো বৈ সঃ", সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের সত্যিকারের সাক্ষাতে ভক্তিযোগে নিজেকে দীক্ষিত করে ফেলতে পারি এইটাই হবে আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

আপনারা সেইরকম হৃদয় নিয়ে সেখানে যাবেন। কিছু সুবিধা অসুবিধা নিশ্চয়ই হবে। আমাদের ব্রহ্মচারী প্রভুগণ,

এঁরা সকলেই খুব মাননীয় এবং খুব স্নেহশীল। এঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন আপনাদের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে। তবুও হয়ত একটু উনিশ-বিশ হতেই পারে, স্বাভাবিকভাবেই। তা আপনারা এইরকম হৃদয় নিয়ে যাবেন জগন্নাথের কাছে যে যেন তিনি কৃপা করে আমাদের তাঁর দর্শন দেন, তিনি কৃপা করে তাঁর ধামের ধূলো আমাদের দেন আর আমরা সেখানে ঘুরে বেড়াই এই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংসচূড়মণি
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধাম-দেব-স্তোত্রম
অমৃতবিদ্যা (বাংলা ও উড়িয়া)
শ্রীশিক্ষাষ্টক
সুবর্ণ সোপান
শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
শাশ্বত সুখনিকেতন
The Search for Sri Krishna :
Reality the Beautiful
(English, Spanish, Hungarian, Italian & Swedish)
Sri Guru and His Grace
(English, Spanish, Russian & Bengali)

The Golden Volcano of Divine Love
(English & Spanish)
Bhagavad Gita:
Hidden Treasure of the Sweet Absolute
Loving Search for the Lost Servant
(English & Spanish)
Life Nectar of the Surrendered Souls
(Prapanna-jivanamrtam)
Sermons of the Guardian of Devotion
(Vol. I, II, III & IV)
Subjective Evolution of Consciousness
The Mahamantra
Golden Staircase
Home Comfort
Holy Engagement
Absolute Harmony

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীব্রহ্মসংহিতা
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলী
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
শ্রীনামতত্ত্ব নামাভাস ও
নামাপরাধ বিচার
শ্রীনাম ভজন বিচার ও প্রণালী
শরণাগতি
কল্যাণকল্পতরু
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
শ্রীচৈতন্যভাগবত
The Bhagavat

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের ও তাঁর সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী

ভক্তিকল্পবৃক্ষ
Benedictine Tree of Divine Aspiration
Divine Guidance
Divine Message for the Devotees
The Divine Servitor
Dignity of the Divine Servitor